করছে। তুমি দেখবে বাবা-মা যদি হাসি মুখে আমাদের আশীর্বাদ করেন তাহলে ঠিকই সন্তান হবে আমাদের। চলো আমরা এবার বড়দিনে বাবা-মার সাথে কথা বলে অরফ্যানেজ থেকে একটি সন্তান দত্তক নেই। দেখবে সেই সন্তানের লালন-পালন ঠিকভাবে করলে একদিন সত্যিই ঈশ্বর আমাদের দিকে ফিরে তাকাবেন। এমন ঘটনার কথা আমি আগেই শুনেছি। অনেকেই নাকি সন্তান না হওয়ায় দত্তক নিয়ে সন্তান বড় করেছে। বিশ বছর পরেও তাদের ঘরে সন্তান দিয়েছে ঈশ্বর।

আনিকার কথা শুনে চমকে উঠে আকাশ। তার দিকে কিছু সময় চোখ বড় করে তাকিয়ে থেকে বলে, আমার তাই মনে হয়, ঈশ্বর যেন আমাদের পরীক্ষা করছে। এক সময় দু'চোখ তার ছলছল করে ওঠে। দু'হাতে আনিকার দু'কাঁধে শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে তুমি আমার ইচ্ছের কথাই বলেছ। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম তোমাকে এমন প্রস্তাব করব কিন্তু তোমার সাথে আমার মনে হচ্ছিল ক্রমেই কেমন যেন দূরত্ব তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। তুমি আবার এমন প্রস্তাবে মন খারাপ করবে ভেবে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

বড়দিনের পর চলো আমরা পানজোরা সাধু আন্তনীর গির্জায় যাই। সেখানে গিয়ে মানত করি। আকাশ আনিকাকে জড়িয়ে ধরে। এ অবস্থায় কল্পনা করে, তাদের কোলে সন্তান আসবে। আনিকা সন্তান নিয়ে খেলা করবে আর ওর কাছ থেকে সে টেনে নিবে তাদের নবজাতককে। কল্পনা করতে করতে বলে, আমি মানত করেছি। চল আগে বাড়ি যাই, তারপর সাধু আন্তনীর পায়ে মানত দিয়ে নতুন করে আমরা আবার জীবন শুরু করি।

দু'জনের আলাপে নতুন করে সেই বিয়ের পর প্রথম আলোচনা করে যেভাবে সংসার শুরু করেছিল সেই মানসিকতাই প্রকাশ পায়।

বড়দিন উপলক্ষে তাদের বাড়ি যাবার প্রস্তুতি নেওয়া শেষ। দু'জন চাকরির ক্ষেত্রে সারা বছর ছুটি না নিয়ে বছর শেষে সবাই মিলে গ্রামের বাড়ি বড়দিন করার জন্য ছুটি জমায়। তাই ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি চলে যায় গ্রামের বাড়ি। ফিরে আসে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে তারা বড়দিন উপলক্ষে কেনাকাটা সারে। এরপর একদিন দু'জন মিলে বাসে চড়ে চলে যায় গ্রামের বাড়ি।

এবারও তারা বাড়ি যাবার কথা ঠিক করে। কিন্তু তাদের সাথে ভিন্ন এক পরিবার বেড়াতে যেতে আগ্রহ দেখালে তাদের নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে দেরি হয়। সেই পরিবার আকাশের কলিগ হলেও তারা বলেছে এবার তাদের সাথে তাদের গ্রামে যাবে। কিভাবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বড়দিন উদ্‌যাপন করে তা দেখার ইচ্ছে তাদের। যে কারণে দেরি করে হলেও যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

বড়দিন যত ঘনিয়ে আসে তারা দিনক্ষণ গুনতে থাকে কবে যাবে। এরপর বাইশ ডিসেম্বর যাবার জন্য সিদ্ধান্ত হয় তাদের। যাবার দিন তারিখ ও সময় ঠিক করে যাবার জন্য এবার প্রাইভেট গাড়ি ঠিক করে। আকাশের কলিগ নতুন বিয়ে করেছে। তারা একই বাসায় সাবলেইট থাকে। সকাল সকাল তারা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় গাড়ির ড্রাইভার ফোন করে বলে, তার আসতে দেরি হবে। হঠাৎ করেই তার স্ত্রী বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। স্ত্রীর সব ব্যবস্থা করে তারপর আসতে ঘন্টা দুই দেরি হবে।

আকাশ আর আনিকা তখন আর কোন কিছু জানতেও চায়নি কি হয়েছে বা কি। তারা মনে করেছে মানুষ তো, যে কোন সময় যে কোন সমস্যা হতেই পারে। সে তো আর ইচ্ছে করে দেরি করছে না। তাছাড়া আসলেই সব জানা যাবে গাড়ির ড্রাইভারের স্ত্রীর কি হয়েছে?

আকাশ তার কলিগ বা সাবলেইটকে দেরি হবার কথা বললে তারা ঘরে বসে টেলিভিশন দেখে। হিসেব করে দেখে ঘর থেকে বের হতে তাদের দুপুর প্রায় গড়াবে। তাছাড়া আকাশদের বাড়ি যেতে সময় লাগবে আরো প্রায় দুইঘন্টা। তার মানে পুরো দুপুর। এর মধ্যে কিছু খেয়ে নেবার জন্য বাসায় রান্না চড়িয়ে দেন। আকাশ যেহেতু নিজেদের বাড়ি যাবে, তাই ক্ষুধা লাগলেও বাড়িতে গিয়েই খাবে মনে করে কোন আয়োজন করেনি। সে বিছানায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছিলো। ঘন্টাখানে পর গাড়ির ড্রাইভার এসে দরজার কড়া নাড়লে আকাশ বেরিয়ে এসে দেখে ড্রাইভার হাতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশ অবাক হয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, - কি ব্যাপার? আপনি বললেন আপনার স্ত্রী অসুস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন আর এখন আপনি মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির? কোনো সুখবর আছে নাকি?

- স্যার ভাবী কই? ভাবীর জন্য মিষ্টি নিয়ে এলাম। একটা সুখবর আছে স্যার। ভাবীকে ডাকেন তারপর বলি।

আকাশ সেখানে দাঁড়িয়ে দরজার লকারে হাত রেখেই আনিকাকে ডাকে, কই আনিকা, দেখ রফিক মিয়া তোমার জন্য মিষ্টি নিয়ে এসেছে। কি নাকি আবার সুখবরও আছে তার, আমাকে বলছে না।

পাশের ঘর থেকে তার কলিগ আর স্ত্রী এবং আনিকা তিনজনই এক সাথে বেরিয়ে এলো কি সুখবর জানার জন্য।

ড্রাইভার তাদের আগের পরিচিত। বাইরে বা দূরে কখনো ঘুরতে গেলে তাকেই নিয়ে যায়। অনেকটা ঘনিষ্ঠজন। সে কারণেই তাদের যাত্রাপথে মিষ্টি নিয়ে আসা। সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আনিকার দিকে মিষ্টির প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ভাবী আমি প্রথম সন্তানের বাবা হলাম আজ। অনেকদিন পর আল্লাহ আমাদের সংসারে ফুটফুটে সন্তান দিয়েছে। হাজার শুকরিয়া।

রফিক মিয়ার কথা শুনে তাৎক্ষনিকভাবে আনিকা মন খারাপ করে। পুরো চেহারাটা তার বদলে যায়। বিষয়টি অন্য কেউ বোঝার আগেই সে হেসে বলে, - আরে রফিক মিয়া তুমি তো ভাগ্যবান। মিষ্টিতো তোমাকে উল্টো আমরা খাওয়াবো। তুমি এনেছ কেন কষ্ট করে?

সেই একই কথা। দশ বছর হতে চলেছে অনেক চেষ্টা করেও এতদিন কোন সন্তান হয়নি। এবার আল্লাহর ইচ্ছাতে বাবা হয়েছি। সন্তান এবং মা দুইজনই সুস্থ আছে।

আনিকার মুখে হাসি ফুটলেও তার মনে যে কিঞ্চিৎ কষ্ট উঁকি দিয়েছিল সেটি একমাত্র আকাশই বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে এড়িয়ে যান। মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে আনিকা রফিক মিয়াকে ভিতরে ডাকে। ভিতরে গিয়ে সামনেই ছোট এক টেবিল রয়েছে। টেবিলের উপর দৈনিক পত্রিকা আর দুইটা কাচের গ্লাস উপুর করে রাখা আছে। সেগুলোর পাশ দিয়ে মিষ্টির প্যাকেট রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। আনিকা বলে, দাঁড়িয়ে আছো কেন, বসো। তোমাকে চা করে দিচ্ছি। চা খাও আর মিষ্টি মুখ কর।

পাশ থেকে সাবলেইট স্বামী স্ত্রী দুজন একই সাথে বলেন, আপনার দেরি হবে শুনে আমরা রান্না চড়ালাম। মাঝপথে রেখে যাওয়া যাবে না। রান্না হলে খেয়েই যাবো।

আনিকা ঘর থেকে তার কথা শুনে এগিয়ে এসে বলল, এ আবার আপনি না জিজ্ঞেস করে কি করতে গেলেন? আমাদের বাড়িতে কি আপনাদের ভাত হতো না?

বলেই আনিকা বড় প্লেটে করে সবার জন্য মিষ্টি নিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে সবার হাতে তুলে দিয়ে বাকি যে কয়টা ছিল সেগুলি টেবিলের উপর রেখে বলে, এই এখানে মিষ্টি রাখা আছে। যার খেতে মন চায় খেয়ে নিয়েন। কেউ কোন কথা বলে না।

খাবার যা হয়েছে সেটুকু দিয়ে সবাই মিলে অল্প করে খেয়ে নেয়। খেয়ে গাড়িতে লাগেজ নিয়ে তুলে। এরপর সবাই ঘর থেকে নিজেদের মতো বের হয়ে গাড়িতে চড়ে বসলে রফিক মিয়া গাড়ি ছাড়ে। গাড়ি মিরপুর হয়ে সাভারের দিকে রওনা দেয়। বিশাল বড় এক ব্রিজের কাছে যাওয়ার পর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কিছু গাছগাছালির পাশে গিয়ে রফিক মিয়া গাড়ি থামায়। গাড়ি থামিয়ে নিরাপত্তার জন্য গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে সবার চোখের আড়ালে রাস্তা থেকে সামান্য দূরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে বসতেই বাচ্চার কান্না তার কানে ভেসে আসে। প্রথমে রফিক ভয় পেয়ে যায় কান্নার শব্দে। যখন তার কানে ভেসে আসে কান্নার শব্দ তখন সে চাইলেই উঠতে পারছিল না। কিন্তু ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপছিল। কি করবে কোনো দিশে না পেয়ে এদিক-সেদিক তাকায় আর কাজ সারে। কাজ শেষে উঠে কান পেতে শোনে কোথা থেকে আসে এই কান্নার শব্দ। পরিষ্কারভাবে যখন বুঝতে পারে এ কোন ছোট্ট শিশুর কান্না অন্যকিছু নয় তখন কান্নার নির্ধারিত জায়গার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে একপা দুই পা করে। কিছুদূর সামনে গিয়ে দেখে কাপড় দিয়ে পেচিয়ে রাখা ছোট্ট এক ফুটফুটে বাচ্চা গায়ে তার জন্মের সময়কার কিছু ময়লা লেগে আছে। কাপড় দিয়ে পুরো শরীর পেচানো থাকলেও মুখ আর দুই হাত বের করে উপর দিকে তুলে কান্না করছে। হাত দুটি উপর দিকে তুলে কাঁদছে আর মনে হচ্ছে যেন কারো সাহায্য চাইছে। এ দেখে ড্রাইভার রফিক মিয়া চিৎকার করে ডাকলেন, আকাশ ভাই, ভাবী, জলদি আসেন এখানে। দেখে যান কে যেন আমাদের জন্য কত সুন্দর উপহার এখানে ফেলে রেখে গেছে।

রফিক মিয়া বাচ্চাটিকে ধরতে গিয়ে থেমে যায়। বাচ্চাটির খুব কাছেই তার হাত। আকাশ রফিক মিয়ার ডাক শুনে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে যায়। গিয়ে দেখে রফিক মিয়া উপর হয়ে হাত বাড়িয়ে আছে। সামনে তার বাচ্চাটি পড়ে রয়েছে। আকাশ তাকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিজে বাচ্চাটিকে তুলে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। এরপর আশে পাশে তাকিয়ে দেখে বিষয়টি কেউ দেখছে কিনা। কাউকে না দেখতে পেয়ে আনিকাকে ডাকে, এই দেখো দেখো। জলদি আসো এখানে। ততক্ষণে বাচ্চাটি আরো শব্দ করে কান্না করছিল। আনিকার কানে পৌছায় সেই কান্না। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখতে পায় আকাশ বাচ্চাটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

আনিকা কোথায় হাসবে আনন্দে তা না করে চিৎকার দিয়ে বলে, ঈশ্বর এ তুমি আমাকে কি দেখালে? আমরা সাধনা করে একটি বাচ্চার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কত বছর হয় আর এখানে কে ফেলে রেখেছে তোমার দেওয়া এই অবুঝ শিশুটিকে? বলেই আকাশের কোল থেকে নিজে শাড়ির আঁচল লম্বা করে বাচ্চাটিকে নিয়ে পেচিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরে।

সাথে যারা ছিল তারা প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ড্রাইভার যেহেতু প্রকৃতির ডাকে জঙ্গলে ঢুকেছে তার হয়তো কিছু হয়েছে তাই চিৎকার দিয়ে ডাকছে। বিষয়টি এমন ভেবেও এগিয়ে যায়নি। আকাশ আর আনিকা বাচ্চাটিকে নিয়ে যখন গাড়ির সামনে আসে তখন গাড়ি থেকে তারা দু'জন বেরিয়ে এসে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে। জানতে চায় এখানে কে এমন সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাটিকে নির্দয়ের মতো ফেলে রেখে গেছে? বলেই বাচ্চাটির বাবা মাকে অভিশাপ দিচ্ছিলো।

আকাশ গাড়ির পিছনে গিয়ে গাড়ির ট্রাংক খুলে লাগেজ থেকে নতুন টাওয়াল বের করে এনে আনিকার দিকে দিয়ে বলে, - নাও, এটা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরো। ভাগ্য ভালো এর মধ্যে আমরা এখানে এসেছি। সময় মত না এলে তো শিয়াল কুকুরেই হয়তো খেয়ে ফেলতো। মারাও যেতে পারত।

আকাশ চায় আনিকার দিকে। আনিকা চায় আকাশের দিকে। দু'জনই মুখ খোলে কিছু বলার জন্য। কিন্তু ভিতরে আনন্দের ঢেউ খেলে। দু'জন ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলে, - চলো গাড়ির ভিতরে বসি। বাড়ি যাই আগে। বাড়িতে গিয়ে ভাল করে গোসল করিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে ওকে।

গাড়িতে বসে আকাশ বলে, দেখেছ আনিকা, সাধু আন্তনী আমাদের প্রার্থনা ঠিকই শুনেছে।

ড্রাইভিং সিটে বসে রফিক মিয়া বলে, - আজকে আমার সত্যিই কপাল খুব ভাল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাচ্চাই দিচ্ছে উপহার। আকাশ বলেন, - তুমি এখানে গাড়ি না থামালে তো আমরা এই বাচ্চার সন্ধান পেতাম না। আমরাই রেখে দেই এই বাচ্চাটিকে।

সাথে বসা দু'জন কোন কথা বলে না। আকাশ আর আনিকাই কথা বলেছে। আকাশ আবার বলে, - বাড়িতে গিয়ে মাকে বলবো আমরা এতদিন কোন কিছু বলিনি। বলবো আমাদের ঘরেই এই বাচ্চা হয়েছে।

আনিকা বলে, এটাও ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। আমরা ওর দায়িত্ব নেবো সমস্যা কি সত্য বলতে। ঈশ্বর আমাদের সংসারে সরাসরি না দিলে কি হবে অন্যের মাধ্যমে তো দিয়েছে। এই জন্য বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। বলে গাড়ি চালাতে শুরু করে।

সামনে একটা দোকান দেখে সেখানে গাড়ি থামিয়ে পাশে এক বাড়িতে ঢুকে যায় আকাশ আর আনিকা। বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে অনুরোধ করে বলে একটু গরম পানি আর যদি সম্ভব হয় গরম দুধ দিতে, বাচ্চাকে খাওয়াবে। বাচ্চার অবস্থা দেখে কেউ কিছু না বললেও এক অল্প বয়সি মেয়ে দৌড়ে এসে বাচ্চাটিকে আদর করতে চেষ্টা করে। এরপর সে নিজে উদ্যোগি হয়ে বাচ্চাটির জন্য গরম পানি আর দুধের ব্যবস্থা করে।

সেখানেই সেই মেয়েটি বাচ্চাটির গোসল করিয়ে সুন্দর টাওয়াল দিয়ে পেচিয়ে সাথে কিছু ছোট কাপড় দিয়ে বলল, পরে যেন আবার তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বাচ্চাটিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। বলে আকাশ আর আনিকার মোবাইল নম্বর চেয়ে লিখে রাখে।

গাড়ি নিয়ে বাড়ি যেতে বিকেল হয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে আকাশ তার মাকে ডেকে প্রথমেই বলে, দেখো মা তোমার জন্য তোমার বৌমা কি উপহার নিয়ে এসেছে। বলার পর তার বাবা-মা দু'জনেই ঘরে ছিলেন, বেরিয়ে এসে দেখেন ছেলের বৌর কোলে নবজাতক শিশু। কোন কথা না বলেই আনিকার কোল থেকে বাচ্চাটিকে টেনে নিয়ে গালে মুখে চুমু করে আর বলে, দাদু আমার কি সুন্দর হয়েছে দেখতে। ঠিক আকাশের মতোই হয়েছে। আকাশের বাবা বললেন, না-না তুমি চোখ আর নাকটা দেখ, ঠিক বৌমার মতো দেখতে। তা কবে হয়েছে? এত বড় সুখবরটা তোরা আমাদের কাছে গোপন রাখলি কি করে রে? এই বাড়িতে তোমরা কে কোথায় আছো, আসো দেখে যাও আকাশ আর তার বৌ আমাদের বংশে বাতি জ্বালাতে বড়দিনের কত বড় উপহার নিয়ে এসেছে।

ডাক শুনে বাড়ির লোকজন এসে ভিড় করতে শুরু করে। আকাশের কলিগ আর তার স্ত্রী একজন আরেকজনের দিকে চোখাচোখি করে। বাড়িতে তখন নবজাতককে উপলক্ষ করে ধুম পড়ে যায়। সবাই আনন্দে আন্দোলিত হয়ে বলে, এবারের বড়দিনটা সত্যি আমাদের জন্য অন্যরকম হবে॥ ༄

নাড়ীর বন্ধন

জোনাস এ বটলেরু

বাঁধন ও নয়ন দু'ভাই। মায়ের দু-চোখের দু'মণি। বাঁধনের বয়স ৪ বছর আর নয়নের বয়স ২ বছর। বড়ই অভাবের সংসার। বাবা দিনমজুরী করে কোন রকম সংসার চালায়। দিন মজুরী করে বাবা চাল-ডাল নিয়ে আসবে, তবেই মা রান্না করবে। সে অপেক্ষায় থাকে বাঁধন আর নয়ন। মা মাঝে- মাঝে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে। তাও সব সময় হয় না। আবার হলেও করতে পারে না। ছেলের দুটির অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। অপুষ্টিতে ভোগ। বাঁধন ও নয়নের মাঝে তাদের আরেক ভাই ছিল, গত বছর মারা গেছে। সন্তান হারানোর ব্যাথায় মা আজও কাঁদে। তাই ওদের অসুখ-বিসুখ হলে মা কোন কাজ করে না, শুধু ওদের দুজনকে আঁকড়ে ধরে থাকে। পাছে আরেক জনকে হারাতে হয়।

মেলা বসেছে পাশ্বের গ্রামে। বাঁধন ও নয়ন মেলা দেখতে যাবে। তাই একদিন মা ওদের মেলায় নিয়ে গেল। ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলায় একটা ছাগলছানা দেখতে পায়। ম্যাঁয়-ম্যাঁয় করছিল। বাঁধন ছানাটাকে কোলে করে নিয়ে বসে রইল। মা এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলো, কেউ ফেলে রেখে গেছে কিনা। অবশেষে কাউকে না পেয়ে, ছাগলছানাটা তারা বাড়ি নিয়ে এলো। বাঁধন ও নয়ন সারাদিন ছাগলছানা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কঁচি-কঁচি গাছের পাতা এনে ছাগলছানাকে খাওয়ায়। আর রাতে ছাগলছানাকে নিয়ে ঘুমায়। এমনি করে বছর কেটে গেল। ছাগলটি দুটি বাচ্চা ছিল। নয়ন ও বাঁধন মহাখুশী। ছাগলটি এমন আধা কেজি দুধ দেয়। এক পোয়া পাশ্বের বাড়ির দিদির কাছে বিক্রয় করে আর এক পোয়া বাঁধন ও নয়ন রাতে দুধ ভাত খায়। যেন ওদের একটু পুষ্টির যোগান হলো। কয়েকদিন হলো তাদের বাবার শরীর ভালো না। ডাক্তার দেখানোর পয়সা নাই। কাজেও যেতে পারে না। মা বাঁধন ও নয়নকে বাবার কাছে রেখে বাড়িতে-বাড়িতে কাজ করে রাতে ফিরে। তার পর রান্না করে সবার মুখে ভাত দেয়। যা অবশিষ্ট থাকে, তা পান্তা করে রেখে দেয় পরের দিনের জন্য। কয়েকদিন হলো বাঁধন ও নয়ন ছাগলের দুধ দিয়ে ভাত খায় না। বাবা অসুস্থ, তাই মা-বাবাকে দুধ খেতে দেয়। কিন্তু বাবা আর সুস্থ হলো না। একদিন মারা গেল। বাঁধনের মা দিশেহারা হয়ে গেল। এখন কি করবে, কি করে ওদের মানুষ করবে। দুঃখের বোঝা আরও ভারী হলো।

বাঁধনের বয়স এখন ৫ বছর। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে তার মা। বাঁধন সকালে উঠে পান্তা খেয়ে স্কুলে যায়। আসে বারটায়। আর মা নয়নকে নিয়ে মানুষের বাড়িতে কাজ করতে যায়। দুপুরে যে খাবার দেয়, তা মা-ছেলে খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে। ছোট ছেলেকে উঠানের বসায়ে মা কাজ করে বাড়ি-বাড়ি। কখনো মুড়ি ভাজে, কখনো ধান সিদ্ধ করে, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে। আবার কখনো পিঠা বানায়। গরম-গরম মুড়ি বা পিঠা যখন মালিকের ছেলে-মেয়েরা খায়, নয়ন তখন চেয়ে থাকে। মা চেয়ে দেখে ছেলের দৃশ্য, একটা খেতে পারলে যেন নয়ন খুশী হতো। তখন মার হৃদয় খাঁ-খাঁ করে, আচল দিয়ে চোখ মুছে। শিশুর এমন চেয়ে থাকা কোন মা-ই সহ্য করতে পারে না। একটু মুড়ি কিংবা দু-একটা পিঠা মা চেয়ে আনে দুইছেলের জন্য। বাড়ি ফেরার পর দু'ভাই খায় আর মা রাতের রান্না করে।

এমনি করে চললো আরও পাঁচটি বছর। বাঁধন এবার ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। আর নয়ন ৩য় শ্রেণীতে। বাঁধনের বয়স ১০/১১ বছর, আর নয়নের ৮/৯ বছর। মা এখন আর তাদের মালিকের বাড়িতে নিয়ে যায় না। দুইভাই স্কুল থেকে এসে ছাগলের খাওয়ার ঘাস যোগাড় করে। তারপর দুপুরে পান্তা খেয়ে পড়তে বসে। পড়াশুনায় নয়ন একটু ভাল। কারণ বাঁধন নয়নকে পড়াশুনায় সাহায্য করে। সন্ধ্যায় মা বাড়ি ফিরলে, দু'ভাই মাকে ঝাঁপিয়ে ধরে। মা দুই ছেলেকে দুই পার্শ্বে মাথার হাত বুলায়ে দেয়। সারাদিন ক্লান্তির পর ছেলেদের আদরে যেন মা'র সমস্ত দুঃখ, ক্লান্তি দূর হয়।

আর ৬ মাস পর বাঁধন ক্লাস ফাইভ পাশ করবে। হাই স্কুলে পড়ানোর সামর্থ নেই। তাই মা রাতে শুয়ে-শুয়ে ভাবে, বাঁধন এখন কি করবে। পার্শ্বের বাড়ির দিদির জামাই কোলকাতা চাকুরি করে। অনেক পয়সা উপার্জন করে। বছর-বছর বাড়ি আসে। শুনেছি বড় হোটেলে কাজ করে। তাই একদিন বাঁধনের মা দিদিকে বললো "দিদি, বাঁধনের পড়াশুনা শেষ। আমি তো আর ওকে হাই স্কুলে পড়াতে পারবো না। তাই দাদাকে বলে বাঁধনের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করে দাও না দিদি।" দিদি বাঁধনের মাকে ভালবাসতো, আপদে-বিপদে সাহায্য করতো। দিদি বললো আচ্ছা, এবার এলে আমি তোমার দাদাকে বলবো। বাঁধনের মা খুব খুশী হলো, আর আশায়-আশায় ৬ মাস পার করলো।

বাঁধন ৫ম শ্রেণী পাশ করলো। মা একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে জিজ্ঞাসা করলো :

মা - বাঁধন, স্কুলতো পাশ দিলি, এবার কি করবি?

বাঁধন - মা আমি বাবার মত কাজ করবো।

তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। আমি তো বড় হয়েছি।

মা-পার্শ্বের বাড়ি রতনের বাবার সাথে কোলকাতা যাবি? আমি দিদিকে বলে রেখেছি।

রতন - হুঁ, যাবো।

বড়দিন করার জন্য রতনের বাবা বাড়িতে এসেছে। রতন সুন্দর-সুন্দর জামা-কাপড় পড়ে। রং-বেরং এর চকলেট খায়। নয়ন ভাবে দাদা কোলকাতা গেলে তার জন্যও সুন্দর জামা-কাপড় ও চকলেট পাঠাবে। তখন কি মজা হবে।

বড়দিন হলো, ফাস্ট জানুয়ারি হলো। এবার রতনের বাবার কোলকাতা যাবার সময় হলো। একদিন বাঁধনের মা রতনের বাড়িতে গেল এবং জিজ্ঞাসা করলো "দিদি দাদাকে বাঁধনের ব্যাপারে বলেছিলে? হ্যাঁ বলেছি, তুমি বাঁধনকে এখনই ডেকে আনো। মা বাঁধনকে ডেকে আনলো। বাঁধন তাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। রতনের বাবা দু'চার কথা বাঁধনকে জিজ্ঞাসা করলো, তারপর বললো-ঠিক আছে আগামী রবিবার আমার সাথে যাবে। কোন চিন্তা করো না।" বাঁধনের মা অনেক খুশী হলো। দাদাও দিদিকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

আর মাত্র এক সপ্তাহ। তাই বাঁধন ছাগলের ঘরটা ঠিক-ঠাক করলো, বৃষ্টিতে যেন পানি না পরে। ছাগলের জন্য কুঁড়া ও ভূষী যোগাড় করলো, যেন নয়নের বেশি কষ্ট না হয়। ছাগলের জন্য কয়েকটা খুঁটি ও দড়ি বানায়ে রাখলো। কারণ নয়ন দড়ি ও খুঁটি বানাতে পারে না।

আর দুইদিন বাকী আছে মা সন্ধ্যায় দুইছেলেকে নিয়ে গল্প করছিলঃ

মা-বাঁধন তোর কি খেতে ইচ্ছে করে?

বাঁধন- মা আমার না তোমার হাতে পিঠা খেতে ইচ্ছা করে।

মা-নয়ন আমাকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি?

বাঁধন-হুঁ পারবো। না পারলে তোমাকে চিঠি লিখবো।

মা-আচ্ছা ! তা যেন মনে থাকে।

রবিবার দিন দুপুরে ভাত খেয়ে বাঁধন কোলকাতা রওয়ানা দিবে। তার মনটা বিষন্ন। মাকে, নয়নকে ও ছাগলটাকে ছেড়ে যেতে হবে। তার মনটা হা-হা কার করতে লাগলো। নয়নকে কাছে ডেকে বললো- "নয়ন তুই ভালমতো পড়াশুনা করিছ। আমি তো পড়তে পারলাম না। তুই কিন্তু পড়াশুনা করবি। আমি কোলকাতা যাচ্ছি তোর পড়া-শুনা পয়সা যোগাড় করতে। তোকে অনেক অনেক পড়াশুনা করতে হবে। আর শোন, ছাগলটাকে ঠিকমত খেতে দিছ। ওকে রোজ গোসল করাবি। ভুলে যাবি না কিন্তু।" যাবার বেলায় বাঁধন নয়নকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। তারপর মাকে প্রণাম করে রতনের বাবা পিছু হাঁটতে লাগলো। একটু যাচ্ছে, আর পিছু তাকাচ্ছে। যতদুর দেখা গেল, বাঁধন বার বার পিছু তাকালো। ঘরে এসে মা কাঁদতে লাগল। না খেয়ে থাকলেও এত কষ্ট হয় নাই। দু'ছেলে তার কাছে ছিল। কিন্তু আজ এক ছেলে দূরে চলে গেল। এই ব্যাথা মা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। মায়ের কান্না দেখে নয়নও মায়ের গলা জড়ায়ে কাঁদতে লাগলো।

বাঁধন কোলকাতা পৌঁছলো পরদিন সন্ধ্যায়। শহরে এই প্রথম আসা তার। লাল-সবুজ বাতি, বড়-বড় দালান-কোঠা, গাড়ী-ঘোড়া দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রাতে খেয়ে বাঁধন ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন রতনের বাবার সাথে হোটেলে গেল। বিরাট বড় হোটেল। ঐ হোটেলেই তাকে কিচেন হেলপার হিসাবে চাকরি দিল। বেতন মাসে ৩০ টাকা। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বাঁধন সারাদিন হোটেলে কাজ করে। রাতে এসে ঘুমায়। তখন তার মা ও নয়নের কথা ভীষণ মনে পরে। মাঝে-মাঝে ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকায়ে কাঁদে। মা কেমন আছে। ছাগলটা নয়ন দেখছে কিনা। নাকি ওর কষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নয়ন সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রথমেই বাঁধন দাদাকে খোঁজে। কিন্তু দাদা তো নেই। তারপর সে ছাগল বের করে ঘাস দেয় এবং পান্তা খেয়ে স্কুলে রওনা দেয়। স্কুলে একা একা যায়। বিষন্ন থাকে আর মন। আগে দাদার হাত ধরে স্কুলে যেত। অবশ্য মা কয়েকদিন স্কুল পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে গেছে। আজ মা ভোরেই কাজে চলে গেছে। স্কুল থেকে এসে নয়ন পান্তা খেয়ে দাদা যা যা বলেছে, তা-তা করতো। ছাগলের ঘাস কাটতো, ছাগলকে গোসল করাতো। তারপর নিজে গোসল করে পড়তে বসতো। এমনিভাবে চলছিল নয়নের রুটিন বাঁধা জীবন।

এক মাস হলো বাঁধন কোলকাতা এসেছে। আজ বেতন পেয়েছে, ত্রিশ টাকা। এই তার জীবনের প্রথম উপার্জন। টাকাগুলো নেড়ে চেড়ে বালিশের নীচে রেখে দিল। মাকে পাঠাতে হবে। প্রতি মাসে সে বেতন থেকে ২০ টাকা মার জন্য রেখে দেয় আর ১০ টাকা নিজে খরচ করে। বাঁধনের মা প্রতি সপ্তাহে দিদির কাছে গিয়ে খবর নেয় বাঁধনর কেমন আছে। দাদা কোন চিঠি দিলো কিনা, বাঁধন কোন চিঠি দিলো কিনা।

আগামী মাসে রতনের বাবা দেশে যাবে। তাই বড়দিনের মার জন্য একটা শাড়ী ও নয়নের জন্য একটা শার্ট পাঠাতে হবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাঁধন মার্কেটে ঘোরে ঘোরে মায়ের শাড়ী ও নয়নের শার্ট দেখে। পছন্দ হলেও দাম বেশি বলে কিনতে পারে না। রোজই ফিরে আসে। কিন্তু আজ তাকে কিনতেই হবে। কারণ রতনের বাবা আগামীকাল চলে যাবে। মায়ের জন্য ৫০ টাকার একটা শাড়ী ও ভাইয়ের জন্য ২০ টাকা দিয়ে একটা শার্ট আর ১০ টাকার চকলেট কিনলো। তারপর ভালভাবে প্যাকেট করে, একটা চিঠি লিখে রতনের বাবার কাছে দিয়ে আসলো। পকেট থেকে ১০০ টাকা বের করে রতনের বাবাকে বললো, টাকাটা মাকে দিবেন।

এদিকে বাঁধনের মা দিন গুনছে রতনের বাবা কবে আসবে। বাঁধনের খবর শুনবে। মনটা অস্থির হয়ে আছে। রতনের বাবার আসার খবর পেয়ে সেদিন রাতেই মা নয়নকে নিয়ে দিদির বাড়ি গেল। দাদা বললো বাঁধন ভাল আছে। ১০০ টাকা ও একটা প্যাকেট দিয়েছে। ব্যাগ থেকে তা বের করে বাঁধনের মাকে দিল। নয়ন প্যাকেট মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নিল। আর খুশীতে বাড়ি ফিরে এলো। মা প্যাকেট খোলে দেখতে পেলো- শাড়ী, শার্ট, চকলেট আর একটা চিঠি। মা শার্ট ও চকলেট নয়নকে দিল। আর শাড়ী ও চিঠিটা বুকে ধরে মা কাঁদতে লাগলো। অন্যদিকে নয়ন শার্ট ও চকলেট পেয়ে লাফাতে লাগলো। দৌঁড়ে গিয়ে ছাগলকে একটা চকলেট দিয়ে বললো-বাঁধন দাদা পাঠায়েছে। মজা, তাই না? ছাগলটা ম্যাঁয়-ম্যাঁয় করলো। মা বাঁধনের চিঠি খোলে পড়তে লাগলো।

মা,

তুমি কেমন আছো? নয়ন ভালতো? আমার ছাগলটা কেমন আছে? ছানা দুইটি

নিশ্চয়ই বড় হয়েছে। বড় হলে বিক্রি করে দিও। নয়ন এতগুলোর ঘাস কাঁটতে পারবে না। সারাদিন ছাগল নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ওর পড়াশুনার ক্ষতি হবে। মা আমি মাত্র ৩০ টাকা বেতন পাই। তাই বেশি কিছু পাঠাতে পারলাম না। তোমার শাড়ী পছন্দ হয়েছে? নয়ন শার্ট ও চকলেট পেয়ে খুশী হয়েছে, তাই না মা?

মা, ১০০ টাকা পাঠালাম। তুমি নয়নকে স্কুলের একটা ব্যাগ কিনে দিও। আর তুমি ঘরে পড়ার দু'টা শাড়ী কিনে নিও। তুমি আর তালি দেওয়া শাড়ী পরবে না।

ইতি-

তোমার বাঁধন

কাঁচা হাতের লেখা পড়ে মা সবই বুঝতে পারলো। আর বালিশে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলো। এতটুকু ছেলে, সামান্য রোজগার। তা আবার মা-ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজের জন্য কিছুই রাখে নাই। হয়তো বাড়ির কাপড়-চোপড়গুলো আজও পরছে। নিজের জন্য কিছুই কিনে নাই। এইসব কথা মনে করে মা নয়নকে জড়ায়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।

একমাস পর রতনের বাবা আবার চলে গেল কোলকাতা। বাঁধন পিঠা পছন্দ করে। তাই শুধু পিঠা পাঠিয়েছে, আর একটা চিঠি। পিঠা পেয়ে বাঁধন অনেক খুশী। এতদিন পর মায়ের হাতের স্বাদ। মজা করে খেল। তারপর চিঠি পড়তে বসলো।

বাবা বাঁধন,

তোমার পাঠানো টাকা ও জিনিস পেয়েছি। নয়ন অনেক খুশী হয়েছে। কি দরকার ছিল টাকা পাঠানো। সামান্য টাকা পাও, তাও আবার বাড়ির জন্য পাঠায়ে দিয়েছো। আর টাকা পাঠাবে না। আমি সংসার চালাতে পারবো। বিদেশের বাড়ি অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবেন তোমাকে, নিজের কাছে একটা টাকাও রাখনি। তোমার ছাগল খানাগুলো বড় হয়েছে। এবার ঈদে দু'টি রেখে বাকীগুলো বিক্রয় করে দিবো। তুমি বাড়ির জন্য চিন্তা করো না। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করো। ভালমতো কাজ শিখো।

ঈশ্বর তোমার সদয় হোক।

ইতি

তোমার-মা

চিঠি পড়ে বাঁধনের বুকটা যেন হালকা হয়ে গেল। কতদিন পর মায়ের হাতে পিঠা খেলো, মায়ের কথা শুনল। চিঠি সে বালিশের নিচে রেখে দিল। মায়ের কথা মনে হলেই চিঠি খুলে পড়ে। এমনি করে গেল ৫টি বছর। বাঁধন এখন বড় হয়েছে, দেখতেও সুন্দর। কাজ-কর্মে অত্যন্ত দক্ষ। প্রমোশন পেয়ে এসিস্ট্যান্ট শেফ হয়েছে। বেতনও পায় ভাল। বাড়িতে রীতিমত টাকা পাঠায়। মা আর মানুষের বাড়িতে কাজ করে না। বাড়িতে ঘর তুলেছে। গোয়ালভরা গরু-ছাগল হয়েছে। নয়ন এবার ক্লাশ নাইনে পড়ে। আগামীতে মেট্রিক পরীক্ষা। বাঁধন আগামী মাসে বাড়ি আসবে। মা ও নয়ন রোজই দিন গোনি আর কয়দিন বাকী। বাঁধন বাড়ি আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রোজই মার্কেটে যায়। মা ও ভাইয়ের জন্য যা পছন্দ হয় তাই-ই কিনে। মার জন্য শাড়ী, সোনার গয়না, স্যান্ডেল ইত্যাদি। আর নয়নের জন্য দামী শার্ট-প্যান্ট, ঘড়ি, জুতো ইত্যাদি। জিনিস বাক্সে ভরে আর ভাবে, মা কোনদিন একটা ভাল শাড়ী পরেনি। খালি পায় এতোদিন কাটিয়েছে। আর নয়ন ছেঁড়া শার্ট পরে স্কুলে গিয়েছে। এবার ওকে ছেঁড়া শার্ট ও খালি পায়ে স্কুলে যেত হবে না। এ ভাবতে-ভাবতে বাঁধনের চোখে জল আসে।

মা ও নয়নের দিনগোনা শেষ। আজ দাদা আসবে। দাদা দেখতে কেমন হয়েছে, ওর জন্য কি কি আনবে। কতদিন পর দাদাকে দেখবে, সে খুশীতে নয়ন আত্মহারা। সকাল থেকে রাস্তার দিকে তাঁকিয়ে আছে নয়ন। আর মা তো খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ছেলের আশায় বসে আছে। কখন বুকে জড়ায়ে ধরবে সোনা-মানিককে। এদিকে নয়নের চিৎকার শুনে মা ঘর থেকে বের হলো। মা, দাদা এসেছে। ঐ দেখ, দাদা কত বড় হয়েছে। বাড়ি পৌঁছেই বাঁধন নয়নকে জড়িয়ে ধরল, আর মাকে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। মায়ের চোখ দিয়ে গড়-গড় করে জল পরতে লাগলো। মা-পুত্রের আনন্দের অশ্রু, কতই না মধুর।। বাঁধন মার পার্শ্বে বসে বলছে-মা দেখ, নয়ন কত বড় হয়েছে। বড়তো হবেই, ক্লাশ নাইনে পড়ে। এবার নয়নকে ডাক দিল, তারপর বাক্স খোলে নয়নের জিনিসপত্র দিতে লাগল-

বাঁধন-এই নেয় তোর শার্ট ও প্যান্ট।

নয়ন-দাদা অনেক সুন্দর, অনেক দাম নিয়েছে, তাই না দাদা?

বাঁধন-তোর ঘড়ি।

নয়ন-কি সুন্দর ঘড়ি! হাতে পরে মাকে দেখাচ্ছে। মা, এখন থেকে স্কুলে আর লেট হবো না।

বাঁধন-এটা হলো তোর জুতা। আর খালি পায়ে স্কুলে যাবি না। সর্বশেষ এই হলো তোর চকলেট।

নয়ন-দাদা আমার জন্য এতকিছু এনেছো মার জন্য কিছু আনোনি?

বাঁধন-এনেছি রে। এই হলো-মায়ের শাড়ী, গয়না, স্যান্ডেল।

মা-বাবা তুমি এতো শাড়ী ও সোনার গয়না আনতে গেলে কেন? আমি কি এগুলো পরি।

বাঁধন-মা, তুমি সারাটা জীবন তালি দেওয়া কাপড় পরেছো। হাতে দু'টা চুড়িও পরোনি। এগুলো তোমাকে পরতে হবে মা।

মা-বাঁধন কতদিন থাকবা?

বাঁধন-২ মাস থাকবো মা। এই ছুটিতে গোয়াল ঘরটা ঠিক করবো। আর বাড়িতে আরেকটা নতুন ঘর তোলব।

মা-ঘর দিয়ে কি হবে। তুমি বিয়ে করবে?

বাঁধন-না, মা। আমি এখন বিয়ে করবো না। নয়নের পড়াশুনা শেষ হোক, তারপর দেখবো। নয়নতো বড় হয়েছে।

ওকে নিরিবিলিতে পড়তে হবে। ওর টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি দরকার। তাই একটা ঘর দরকার মা।

দেখতে দেখতে ২ মাস কেটে গেল। সমস্ত কাজ শেষ করলো বাঁধন। এই দু'মাস গরু ছাগলের ঘাস কাটা, গোসল করানো যাবতীয় কাজ বাঁধন নিজে করলো। নয়নকে কোন কাজই করতে দিল না। নয়নকে শুধু পড়ার উৎসাহ যোগালো। নয়নের জন্য মাস্টার ঠিক করে দিল। যেন সে ভাল রেজাল্ট করতে পারে। মাও ছেলের পছন্দের খাবার ও পিঠা তৈরি করে খাওয়ালো। কাল বাঁধন চলে যাবে। সন্ধ্যায় নয়ন ও মাকে নিয়ে বসল। বাঁধন বললো- মা তুমি কোন কাজ করবে না। শুধু নয়নের প্রতি খেয়াল রাখবে যেন পড়াশুনার কোন ক্ষতি না হয়। নয়নকে বললো, নয়ন ভাল রেজাল্ট করতে হবে। তারপর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে বিদেশে পড়াশুনা করতে হবে। আমি পড়া-শুনা করতে পারি নাই। তোকে পড়াশুনা করতে হবে। টাকা-পয়সার জন্য কোন চিন্তা

(৯১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

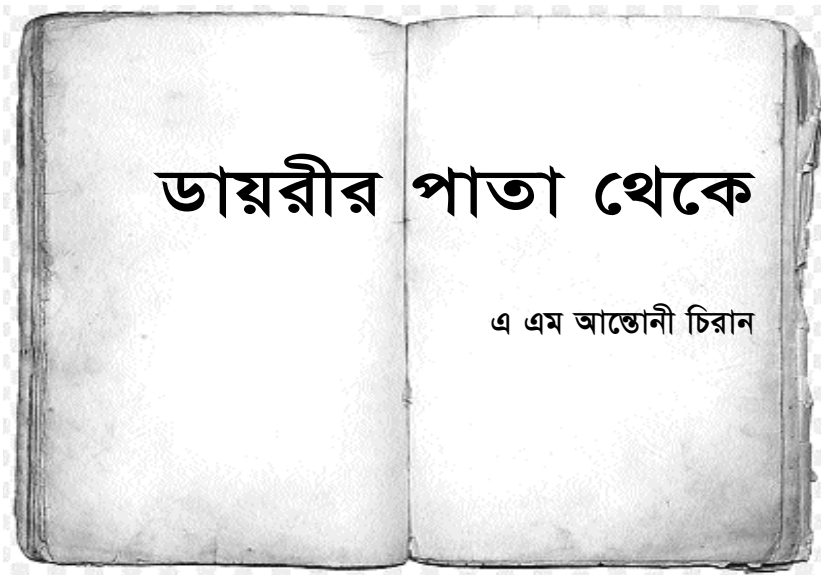

ডায়রীর পাতা থেকে

এ এম আন্তোনী চিরান

বহুদিন হয় গল্প লেখা হয়নি। চাকুরী জীবনের কর্মব্যস্ততায় বহু মূল্যবান সময় পেরিয়ে গেছে আমার সাহিত্যমোদী মনোজগত থেকে। সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর রাত্রে যে মূল্যহীন সময় পেয়েছি তাও দৈহিক, মানসিক ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছি। বিছানায় গা এলিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা নিজে টের পাইনি। আগে যা কয়টি গল্প, কবিতা লিখেছি তাও নিতান্তই অবসর সময়কে বিনোদন হিসাবে নতুবা একটা কিছু করে সময় কাটানোর প্রয়াসেই। আর যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমি একজন বেকার যুবক ছিলাম। আজকে যে গল্পটি লিখতে বসেছি তা চাকুরী জীবনের ব্যস্ততার করিডোরে ঢুকে। একজন গ্রামীণ এলাকার এক অবলা নারীকে কেন্দ্র করে। হয়তোবা অনেকেই ভাবতে পারেন, বলতেই পারেন প্রত্যক্ষ কারোর জীবন চরিত্রকে নিয়ে লেখালেখি করতে নেই। তাতে উপমিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, নষ্ট হয়। তবে যে কোন গল্প বা কাহিনীই হোক লেখক তার লেখনীর বিষয়বস্তুকে কোন না কোন ব্যক্তির বাস্তব জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই লিখে থাকেন, বা উপস্থাপিত করেন। হয়তোবা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্নজনের প্রকাশ ভঙ্গী, লেখনীর ভাষা, উপাত্ত, বিষয়ের উপস্থাপনা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কাহিনী বা গল্পই হলো মানবিক জীবনের প্রবাহমান ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। হয়তো এর মধ্যে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য, পরিশেষে, উপমা থাকতে পারে। যা সাহিত্য সৃষ্টিকে সুন্দর ও স্বার্থক করে তোলে।

বাস্তবে জীবনে মানুষ এমন কতকগুলো পরিস্থিতির মধ্যে থাকে, যা এমন কতকগুলো ঘটনা, যা অলৌকিক কিংবা কতকগুলো ঘটনা লৌকিক থাকে। মানব জীবনের এই যে ঘটনাপ্রবাহ বা বাস্তব ঘটনাগুলোকে এড়িয়ে চলা, অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। যৌক্তিকতাও নেই। আমি যে গল্পটি লিখা শুরু করেছি তা মনোনীতা নামের একজন গ্রামীণ অবলা নারীর। অবলা বলা মানে নারী সমাজকে আঘাত করা, মানবিক দৃষ্টিতে- নারী সমাজের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়, শিক্ষিত সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এমনই একজন নারী মনোনীতা যা জীবন কাহিনী নিয়ে গল্প যার বাস্তব জীবনটা আংশিক হলেও প্রত্যক্ষ করেছি, তার দুর্দিনের সহভাগী হতে পেরেছি।

মনোনীতা মা-বাবার পরিবারে একমাত্র মেয়ে। মা-বাবার একমাত্র আলালের ঘরে দুলালী হয়েও লেখাপড়ায় সে বেশিদূর আগাতে পারেনি। তার ছোটবেলায়ই বাবা মারা যান পাহাড়ে গাছ কাঁটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে। এরপর মায়ের হয়ে যায় ব্রেষ্ট ক্যান্সার। একদিকে মায়ের চিকিৎসা, অন্যদিকে সংসারের হাল ধরতে গিয়ে লেখা-পড়া বাদ দিয়ে ঢাকা শহরে পাড়ি জমাতে হয় চাকুরীর সন্ধানে। এ ব্যাপারে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলে ঈশ্বরের করুণায় কাজও পেয়ে যায় এক বিদেশী হাউসে। যদিওবা সেইকালে গারোরা পরের ঘরে খেটে খাওয়াকে রেংমা খাথিয়া বলত অর্থাৎ দাসীবৃত্তি বলত; মেয়ে হলো তো কোন কথায়ই নেই। তবুও সমাজের বাঁধা-গণ্ডি পেরিয়ে তার সম্ভাবনাময় জীবনকে নিয়তির কাছে বিসর্জন দিয়ে বেছে নেয় চাকুরী নামক বেঁচে থাকার কষ্টময় অবলম্বনকে।

মনোনীতার সাথে আমার দেখা হয়,পরিচয় হয় ঘটনাক্রমে। আমি ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ গিয়েছিলাম ঢাকায়। আমাদের তিনদিনের কর্মশালা ছিল। এই তিন দিনের প্রথমদিনের সেশন শেষ করে কিছু কেনা-কাঁটার জন্য শহরে যাব বলে বাইরের ফটকে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় দেখলাম মনোনীতা তার অসুস্থ মাকে নিয়ে রিক্সা থেকে নামতে চেষ্টা করছে। মাকে তার রিক্সা থেকে নামাতে কষ্ট হচ্ছে দেখে আমি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। রিক্সা থেকে নামিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম- 'না.সং বাচ্চানি রি.বাংআ? অর্থাৎ 'তোমরা কোত্থেকে আসছ?' মনোনীতা উত্তর করল- 'ম.ক আগান্ন দাদা। চিংয়াদে হাসপাতাল চা.আনি রি.বা।' অর্থাৎ 'কি বলব দাদা; আমরা হাসপাতাল থেকে আসছি।' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম- এখন কোথায় যাবে? মনোনীতা বলল, 'বিশপ হাউস চা।' অর্থাৎ বিশপ হাউসে। 'বিশপক আগানি মল্‌মলি গেস্টরুমঅ হাদাম রা.আ।' মানে- 'আমরা বিশপ হাউসে যাব। বিশপকে কয়ে-বলে গেস্টরুমে আশ্রয় নিয়েছি।' তার মায়ের শারীরিক দুরাবস্থা দেখে অনুমান করলাম, মহিলার ব্রেষ্ট ক্যান্সার হয়েছে। এই ঘটনার পর অবসর পেলেই মহিলাকে দেখতে যেতাম, শান্ত্বনার বাণী শুনাতাম। মনোনীতার সাথেও দুএকটি কথা-বার্তা হতো। তার সুখ-দুঃখের কথা আমি শুনতাম। এইভাবে আমি যেন তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। তাদের কাছের-একান্ত মানুষ হয়ে গেলাম। যেদিন বাড়ি ফিরব, সেদিন মনোনীতার সাথে দেখা করতে গেলাম। তার মায়ের জন্য প্রার্থনার পর মনোনীতার কাছে বিদায় নিয়ে এলাম।

তারাও পরের দিন বাড়ি ফিরবে। বাড়ি ফিরে কয়েকদিন হয় এর মধ্যে মনোনীতার মোবাইল ফোন এলো। বলল, আ.মানি জম্মাদে ব্লাকিংআ। অর্থাৎ মায়ের অসুখ বেশিরকম। মা.ন্নোদে রিবাবো আক্খিসা। থাংআমা থাংযা হা.ইযা। অর্থাৎ সময় পেলে দেখে যান। মা কি বাঁচেন কি মরেন জানি না। মনোনীতার অনুরোধ রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকদিনের ঐচ্ছিক ছুটি নিয়ে মনোনীতাদের বাড়িতে গেলাম তার মাকে দেখতে। যদিওবা তাদের ঘর-বাড়ি, গ্রাম আমার চেনা-জানা ছিল না, লোক মারফৎ জেনে নিয়ে তাদের সঠিক ঠিকানায় গিয়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি- মনোনীতা তার মৃতপ্রায় মায়ের শিয়রে বসে প্রহর গুনছে। কখন তার মায়ের প্রাণবায়ু বেরুবে।

আমাকে দেখেই মনোনীতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। আসলেও মানুষের জীবনে এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে যখন মানুষকে বিভ্রান্ত করে হতভম্ব করে, স্থবির করে দেয়। তখন কারোর মধুর বাক্য, শান্ত্বনার বাণী কিংবা আশীর্বাণী ভুক্তভোগী ব্যক্তির কাছে এইসব বাণী গ্রাহ্য হয় না, মূল্যায়ন হয় না; সে তখন থাকে নির্বিকার, নির্বাক। আমার সান্ত্বনার বাণী মনোনীতাকে কতটুকু সান্ত্বনা দিল আমি তখন জানি না। আমি দেখলাম, তার দু'চোখ ভরে কান্নার তপ্ত অশ্রুরে বন্যা বইছে ঝর-ঝর করে। এদিকে তার মায়ের করুণ অবস্থা, আরেকদিকে মনোনীতার কান্না আমাকে, আমার পৌরূষকে সত্যই দুর্বল করে ফেলল। আমার দু'চোখ দিয়েও কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মনের অজান্তে। যাকে সান্ত্বনা দিতে এলাম, যাকে অভয় বাণী শোনাতে এলাম সেই আমি নিজে দুর্বল হয়ে নির্বাক হলাম, পরাজিত হলাম মনোনীতার করুণ অবস্থা দেখে। এই দিকে তার মা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে শেষ বিদায়ের আশায়। দেখতে -দেখতে নিথর হয়ে গেল মনোনীতার মা। এবার কান্নার রোল পড়ে গেল সারা বাড়ি জুড়ে। কান্নার রোল শোনে আশ-পাশের পাড়া-প্রতিবেশি সবাই ছুটে এলো তাদের বাড়ি। আমি তখন নির্বাক দাঁড়িয়ে কান্নার রোল শুনছি আর ভাবছি আমি এখন কি করব।

রাতে কারোরই খাওয়া হলো না। উপোসে উপোসে সারা রাত কেঁটে গেল দুঃখের বোঝা বয়ে। পরের দিন তার মায়ের মৃতদেহের সৎকার করে বাড়ি ফিরলাম। ফেরার সময় মনোনীতা বলেছিল, 'দাদা, তুমি যদি চলে যাও, আমি কাকে নিয়ে বাঁচব দাদা! আমি যে অসহায় হয়ে পড়লাম।' আমি তখন শান্ত্বনার বাণী হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই শুধু বললাম- আমার যে ছুটি শেষ। আমাকে আমার কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। ঈশ্বর যদি চান তো আবার তোমাদের বাড়ি আসবো।' মনোনীতা আর কিছু বলেনি। শুধু আমার পা ছুঁয়ে তার কান্নার অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল আমার ময়লাযুক্ত পদযুগল! আমি তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি, সান্ত্বনাও দিতে পারিনি। সে একা এবং অসহায় জেনেও আমি স্বার্থপরের মতো বাস্তবতার কাছে তাকে একা ফেলে নিজ কর্মস্থলে ফিরলাম॥

নাড়ীর বন্ধন

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

করতে হবে না। তোর মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হলে, আমি আবার বাড়িতে আসবো, তোকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিবো।

যাবার দিন মাকে জড়ায়ে ধরে কাঁদলো বাঁধন। মা তুমি ভাল থেকো। আর নয়নের হাত ধরে বললো-পড়াশুনা করিস কিন্তু নয়ন। মা বাঁধনকে বললো- তুমি শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আমাদের জন্য কোন চিন্তা করো না বাবা। নয়ন কোলকাতা গিয়েই মাকে চিঠি লিখলো। রীতিমত নয়নের পড়াশুনার খোঁজ-খবর নিতো। এদিকে নয়ন দাদার কথামতো মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। টেস্ট পরীক্ষা শেষ করেছে। পরীক্ষার ফলও ভাল হয়েছে। শিক্ষকের আশা নয়ন মেট্রিকে ভাল করবে এবং স্কুলের মুখ উজ্জল করবে। নয়ন মেট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। দিন-রাত ঘরে বসে শুধু লেখাপড়া। শিক্ষকরাও তাকে সাহায্য করছে, উৎসাহ দিচ্ছে। মাও নয়নের প্রতি খেয়াল রাখছে। যেন পড়াশুনার কোন ক্ষতি না হয়। গরু-ছাগল মা-ই সামলায়, পাছে নয়নের পড়াশুনার ক্ষতি হয়। নয়ন চাইলেও মা নয়নকে কোন কাজ করতে দেয় না।

এমনি করে মেট্রিক পরীক্ষার সময় হলো। নয়ন পরীক্ষা শেষ করলো। নয়নের পরীক্ষা রেজাল্ট হওয়ার আগে বাঁধন ছুটিতে বাড়ি এলো। এবার দু'ভাই খুব মজা করলো। একদিন রেজাল্ট বের হলো। স্কুলের শিক্ষকগণ বাড়ি চলে এলো। নয়ন ষ্ট্যান্ড করেছে। বাঁধন ভীষণ খুশী, নয়নের অ-সাধারণ সাফল্যতার জন্য। গ্রামের লোকজনকে মিষ্টি খাওয়ালো। এলাকায় নয়নের নাম ছড়িয়ে পড়লো। নয়নকে কলেজে ভর্তি করিয়ে বাঁধন আবার কোলকাতা চলে গেলো।

আগামী বছর বাঁধন দেশে আসবে। মা ভাবছে এবার বাঁধনকে বিয়ে করাবে। নয়নও বিশ্ববিদ্যালয় পড়া শেষ করে বিদেশ যাবে। কাজেই আর দেরী করা যায় না। মা মেয়ে ঠিক করে রাখলো। বাঁধন দেশে এলো, মায়ের পছন্দের মেয়ে বিয়ে করলো। এদিকে নয়ন বিদেশে পড়া-শুনা করার জন্য যোগাযোগ করছে। ছুটি কাটিয়ে বাঁধন কাজে চলে এলো। নয়নকে বিদেশে পড়াতে হলে অনেক টাকা লাগবে। তাই বাঁধান বেশি বেতনের নতুন চাকুরি নিল। নয়নের বিদেশে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হলো। প্রচুর টাকা খরচ হলো। তাই বাঁধন আর বাড়িতে এলো না। নয়ন বিদেশে পড়তে লাগলো। এরই মধ্যে বাঁধন বউ-এর চিঠি পেল। সে আর বাড়িতে থাকতে চায় না। কোলকাতা আসতে চায়। বাঁধন পরিষ্কার জানিয়ে দিল, মা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তাকে মার সাথেই থাকতে হবে। মাকে সে কোনভাবেই কষ্ট দিতে পারবে না। তারপর থেকে সংসারে শুরু হলো অশান্তি। একদিন রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে গেল বউ।

নয়নের প্রচুর টাকার দরকার। এক চাকুরির পয়সায় নয়নের খরচ কুলাতে পারছে না। বাঁধন আরও একটি চাকরি করতে শুরু করলো। তাই কয়েক বছর আর বাঁধন বাড়ি আসেনি। তিন বছর পর বাঁধন বাড়ি এলো। বউকে বাড়িতে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে কিছুতেই এলো না। এদিকে নয়ন পড়াশুনা শেষ করে বিদেশেই থেকে গেল। মাকে একবার দেখতেও এলোনা। বাঁধন সমস্ত উপার্জন ভাইয়ের পিছে শেষ করল। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনও শেষ হলো। শুধু শেষ হলো না মায়ের বন্ধন। এই যেন নারীর বন্ধন, হৃদয়ের বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন, এক চিরস্থায়ী বন্ধন॥

লকডাউন

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

- দোস্ত, প্যারাসিটামলের এই পাতাটা তোর জন্য। একটা প্যারাসিটামল প্লেনে উঠার ঠিক আগ-মুহূর্তে খাবি। আর একটা খাবি ঢাকায় প্লেন পৌঁছার এক ঘন্টা পূর্বে।

- ঘটনা কী? প্যারাসিটামল খাবো কেন?

- কোয়ারেন্টাইন ফাঁকি দেওয়ার জন্য। ঢাকা বিমানবন্দরে বিদেশ ফেরত যাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে। শরীরের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রার তুলনায় বেশি পাওয়া গেলে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হচ্ছে। প্যারাসিটামল খেলে শরীরের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রার তুলনায় কম থাকবে। কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া লাগবে না। বুজেছিস্ হাদারাম?

- কিন্তু এটাতো নিজের সাথে, পরিবারের সাথে এবং দেশের সাথে প্রতারণা। শরীরে করোনাভাইরাস থাকলে তো পরিবারের সদস্যরাই প্রথমে বিপদে পড়বে। তারপর তা চারিদিকে ছড়াবে জ্যামিতিক হারে। ইতালির অবস্থা নিজের চোখেই তো দেখলি। উন্নত একটি দেশ, এক ভাইরাসে কিভাবে হাবুডুবু খাচ্ছে! প্যারাসিটামল তোর কাছেই রাখ্। আমি খাবো না। আমার শরীরের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রার তুলনায় কম পাওয়া গেলেও আমি স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনে যাবো।

অলক আর লাভলু পাশাপাশি ইউনিয়নের বাসিন্দা হলেও ও'দের পরিচয় ইতালিতে এসে। তারপর ধীরে-ধীরে বন্ধুত্ব। লাভলুর বাবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন তিনি। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে এক আশ্চর্য যোগ্যতায় তিনি সে দলের সাথে ভিড়ে যান। সরকার বদল হলেও চেয়ারম্যানের চেয়ার রক্ষা করতে কোন সমস্যা হয় না। বাবাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই লাভলুর। লাভলুর ধারণা ও'র বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবাদের একজন।

ইতালিতে ও'রা ভালোই গুছিয়ে নিয়েছিলো। বৈধ হওয়ার প্রক্রিয়াটা প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিলো। কিন্তু করোনাভাইরাস সব উলট-পালট করে দিলো। অন্য অনেকের মতো ও'রা চাকুরী হারালো। বৈধ না হওয়ার কারণে সরকার প্রদত্ত করোনাকালীন সুবিধাগুলো পাওয়ার সুযোগ নেই। তাই দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে শরীরের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রার

তুলনায় কম থাকার কারণে লাভলু বাড়ির দিকে রওনা দেয়। অলক চলে যায় স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টাইনে। চৌদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার কথা অলক পূর্বেই বাড়িতে জানিয়ে রেখেছিলো। কোয়ারেন্টাইন কি বুঝতে না পেরে অলকের মা বলেছিলো- কোয়ারেন্টাইন কি জিনিস, বুঝতাছি না বাবা। তবে ঈশ্বরের কৃপায় তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি আসো তাই চাইতাছি।

কোয়ারেন্টাইন থেকে ফিরে ব্যস্ততার কারণে লাভলুর খোঁজ নেয়া হয়নি। দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাভলুর কি অবস্থা? খোঁজ নেয়া দরকার। অলক লাভলুর মোবাইল নম্বরে ফোন দেয়। মোবাইল বন্ধ। বার-বার চেষ্টা করেও লাভলুকে না পেয়ে লাভলুর বাবার নম্বরে ফোন দেয় অলক। লাভলুর বাবার মোবাইলও বন্ধ। সারাদিনে একবারের জন্যও মোবাইলে সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়নি।

লাভলুর কোন সমস্যা হলো না তো? রাতে বিছানায় শুয়ে অলক এপাশ-ওপাশ করে। ঘুম আসে না। অলক সিদ্ধান্ত নেয় সকালে ঘুম থেকে উঠেই লাভলুদের বাড়ি যাবে। গ্রামের রাস্তায় এখন অনেক ইজিবাইক চলে। চেয়ারম্যানের গ্রাম খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই।

রাস্তায় বেরিয়েই ইজিবাইক পেয়ে যায় অলক। লাভলুদের গ্রামের নাম বলতেই ইজিবাইক চালক যেতে রাজি হয়। অলক ইজিবাইকে আরাম করে বসে।

ঘন সবুজের মাঝখান দিয়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে পিচ-ঢালা রাস্তা চলে গেছে। মনোরম পরিবেশ। নিষ্পাপ সমিরণ। ফাঁকা রাস্তা। অপরিচিত শব্দে ইজিবাইক এগিয়ে চলেছে। পাঁচ বছরে গ্রামের চেহারা অনেকটাই পাল্টে গেছে। পায়ে হাঁটা কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। গাড়ি, ইজিবাইক চলছে দেদারছে। প্রতি বাড়িতে বিদ্যুৎ। গ্রামীণ জনপদে শহুরে ছোঁয়া। অলকের বেশ ভালো লাগে। ইজিবাইক চালক হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করে-

- ঐ গ্রামে কাদের বাড়ি যাবেন, ভাইজান?

- চেয়ারম্যানের বাড়ি।

- চেয়ারম্যান কি আপনার পরিচিত?

- না, চেয়ারম্যানের ছেলে আমার বন্ধু। আমরা ইতালিতে এক সাথে কাজ করি। ওখানেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব। আজই প্রথম ও'দের বাড়ি যাচ্ছি। চেয়ারম্যানের বাড়ির কারও সাথে আমার আগে কখনো দেখা হয়নি।

- কিছু মনে কইরেন না ভাইজান। একটা খারাপ খবর আছে। চেয়ারম্যানের বাড়িতে কেউ নাই। চেয়ারম্যানের বাড়িসহ আশে-পাশের আরও পনেরোটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে, গতকাল থেকে। চেয়ারম্যানের ইতালি ফেরত ছেলের করোনা ধরা পড়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের লোক এবং পুলিশ বাড়ির সকলকে এ্যাম্বুলেন্সে কইরা লইয়া গেছে। আর চেয়ারম্যানের কথা কি কমু ভাইজান, করোনার ভয়ে মানুষ যখন উপরওয়ালারে ডাকছে-এমন একটা সময়ে চেয়ারম্যান ত্রাণের চাউল চুরি করতে গিয়ে ধরা

পড়েছে। লোভ সামলাতে পারলো না। পারবে ক্যামতে? এদের তো রক্তের দোষ। চেয়ারম্যানের বাবাও তো চোর ছিলো। একাত্তরে স্বাধীনতার পর ত্রাণের টিন চুরি করে বড় বাজারে জমি কিনেছিলো। এখন ওখানে ছয়তলা মার্কেট। এ চুরির ঘটনা সকলেই জানে। প্রায়ই এসব চুরির ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু চিহ্নিত চোরদের প্রতি যে ঘৃণা থাকার কথা তা দিন-দিন কমে যাচ্ছে ভাইজান। নগদ প্রাপ্তির লোভে এ সকল চোরদের কাছে টেনে নেয়া হচ্ছে। তা না হলে একাধিক চুরির সাথে জড়িত থাকার পরও বাপ-ব্যাটা বার-বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় কি করে?

আজকাল দেখ্তাছি অনেক সৎ লোকও চোরদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে চোরদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সহযোগিতা করছে। আমার এ ইজিবাইকে যখন কোন সৎ লোককে এ ধরণের চোরদের সাথে গল্প করতে করতে যাইতে দেহি- তখন খুব খারাপ লাগে ভাইজান। মাঝে-মাঝে মনে হয় ইজিবাইক থামিয়ে জিজ্ঞেস করি- একটা মার্কা মারা চোরের সাথে ওঠা-বসা করতে আপনার লজ্জা লাগে না? জানেন ভাইজান, আমি আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম। ভালো ছাত্র ছিলাম। অভাবের কারণে পড়াটা আগাইতে পারি নাই। আমার মনে আছে বই-তে পড়েছিলাম-অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। লাইনগুলোর অর্থ এখনো মনে আছে আমার।

তবে একটা আশার কথা কি জানেন ভাইজান? এই প্রথম চেয়ারম্যান চুরি কইরা ধরা খাইছে। এইবার সে উপর মহলের লোকরে হাত করবার পারে নাই। এই যে চেষ্টা কইরাও চেয়ারম্যান ওপর মহলরে হাত করবার পারে নাই, এইটা খুশীর খবর, তাই না ভাইজান? চুরি কইরা কেহ যদি উপর মহলরে হাত করবার না পারে, সঠিক সাজা পায়। তাহলেই তো চুরিডা দ্যাশ থ্যাইকা বিদায় হইয়া যাইবো। তাই না, ভাইজান?

ভাইজান কি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন? আর একটা কথা বইলা শেষ করুম, ভাইজান। এই কথাটা আমার মাথায় বেশ কয়েকদিন যাবৎ ঘুর-পাক খাচ্ছে। কথাটা বলার লোক পাচ্ছিলাম না। গরীবের কথার তো কোন দাম নাই। কেন জানি মনে হচ্ছে, কথাটা আপনাকে বলা যায়। আচ্ছা ভাইজান, করোনার কারণে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কথা বলা হচ্ছে। আবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িসহ আশে-পাশের বাড়ি লকডাউন করা হচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তিসহ বাড়ির সকলরে ধইরা আইসোলেশন না কোথায় যেন লইয়া যাওয়া হচ্ছে। একইভাবে যদি সমাজে চিহ্নিত চোর-দুর্নীতিবাজদের থেকেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয় আর এদের বাড়ি যদি লকডাউন কইরা দেয়া হয়, তাহলে কেমন হয়, ভাইজান? করোনাভাইরাস মানুষের জন্য, দেশের জন্য ক্ষতিকর। চুরি-দুর্নীতিও তো মানুষের জন্য, দেশের জন্য ক্ষতিকর। গরীবের মাথায় সারাক্ষণ শুধু উল্টা-পাল্টা চিন্তা ঘুরা-ফেরা করে, ভাইজান।

ইজিবাইক চালকের কথা শুনে অলক লা-জওয়াব হয়ে যায়। ও' অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শ্রমে-ঘামের মিশেলে গড়া মাঝ-বয়সী ইজিবাইক চালকটির দিকে। এক পর্যায়ে অলক ইজিবাইক চালকের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে। কিন্তু মন ফেরাতে পারে না॥ ৯০

কৃপণ নিমাই মাস্টার

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

তার এ রকম নামকরণ করেছে। নিমাই তা জানা সত্ত্বেও তার জন্য কোন রাগ বা কষ্ট প্রকাশ করে না। কারণ তিনি জানেন কিভাবে বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েদের সুপথে পরিচালনা করতে হয় আর সঠিক শিক্ষা দিতে হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে খুব পছন্দ করে। স্কুলের সব ব্যাপারে নিমাইয়ের পরামর্শ নিয়েই করা হয়। তাই স্কুলের মধ্যে নিমাই মাস্টারের অনেক কদর ও গুরুত্ব রয়েছে। কোন এক শিক্ষক দিবসে তিনি স্কুলের সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তার জীবনযুদ্ধের কথা বর্ণনা করেন। তিনি যখন ৩য় শ্রেণিতে পড়তেন, তখন তার বাবা মারা যান। পরিবারের হাল ধরার কেউ ছিল না। কারণ তার ছোট আরো ২ ভাই-বোন ছিল। যাদের লালন-পালন করতে হতো তার মাকে। তাই তার মা বাড়ির কাজ ছাড়া বাইরে গিয়ে আর কিছু করতে পারত না। তাই বাধ্য হয়ে এত অল্প বয়সে নিমাইকেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে কাজের উদ্দেশে। বাড়ি থেকে বেশ দূরে একটা হোটেলে নিমাইকে প্রথমে খালা বাসন মাজা, তারপর খাবার পরিবেশ আর খাবার বানানোর কাজে যোগ দিতে হয়েছে। এই করে বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। কাজের জন্য স্কুলে যেতে পারেনি। তার পাড়ার-প্রতিবেশি বন্ধুরা যখন স্কুলে যেত তখন নিমাইয়ের অনেক কষ্ট হতো। এত যুদ্ধ করার পরও নিমাই হাল ছাড়েনি। নিজে- নিজে প্রতিজ্ঞা করেছে। পড়াশুনা সে করবেই, তা যে কোন মূল্যেই হোক। কারণ পড়াশুনার জন্য তার ছিল অদম্য আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি। তাই প্রতিদিন অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে নিজে-নিজে পড়াশুনা করতো। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাইয়ের পরিবারের এমন অবস্থা ও তার পড়াশুনার প্রতি এত আগ্রহ দেখে তাকে স্কুল থেকে বিশেষ সুযোগ দিল যেন ক্লাশ করতে না পারলেও সবগুলো পরীক্ষা দিতে পারে। ৫ম শ্রেণিতে নিমাই স্কুলের সবগুলো পরীক্ষায়ই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরপর থেকে নিমাই সব সময় সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতো। এই দেখে মুগ্ধ হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা তার পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নেয়। তখন থেকেই নিমাইয়ের পড়াশুনার প্রতি আরো আগ্রহ বেরে যায়। নিমাই যখন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে তখন চিকিৎসার অভাবে তার মাও তাদের ৩ ভাই বোনকে ছেড়ে পরপারে পারি জমায়। তখন নিমাই যেন নদীর স্রোতের ন্যায় তলিয়ে যাচ্ছিল। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ছোট ভাই বোনকে সঙ্গে নিয়ে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হয়। হোটেলের কাজ, ভাইবোনকে দেখাশুনা করা, তাদের স্কুলে পাঠানো সবকিছুর পরও নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তার এত দূর আসার পিছনে অনেক অজানা গল্প রয়ে গিয়েছিল এত বছর ধরে। কিন্তু আজ তা সবার সামনে উন্মুক্ত হল। তার এই করুণ বেদনাপূর্ণ কাহিনী শুনে অনেকের চোখে অশ্রু চলে এসেছে। আজ ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পেরেছে কেন তাদের নিমাই স্যার তেমন ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভাল জামা কাপড় পড়েন না। আর তাদের পড়াশুনার বিষয়ে এত উৎসাহী ও গুরুত্ব আরোপ করেন কেন। কারণ তিনি চান যেন অবহেলায় ঝড়ে পড়া, অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনা করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে এখন থেকে তারা আর তাদের এই প্রিয় আদর্শবান স্যারকে কৃপণ নিমাই মাষ্টার বলে ডাকবে না॥ ৯০

কৃপণ নিমাই মাষ্টার

সিস্টার সীম্মি পালমা আরএনডিএম

মাস্টার সাহেব সবেমাত্র চায়ের দোকান থেকে বাড়িতে এসেই তার বউকে বলল, কই গো শুনছ, এক কাপ চা কি হবে? এই কথা শোনামাত্রই পরমা মানে তার স্ত্রী চিৎকার করে বলতে লাগল, তোমার কি প্রতি ঘন্টায় এক কাপ চা না হলে দিন চলে না। আমার তো সারাদিন তোমার জন্য চা বানানো ছাড়া বুঝি আর কোন কাজই নেই। আহা! এইভাবে বলছ কেন? এই বলে নিমাই চেয়ারটা টেনে শান্ত-স্নিগ্ধ মনে বসে টিভির রিমোট হাতে নিল। নিমাই মাস্টার হলেন চায়ের পাগল। সারাদিনের মধ্যে অগোনা কয়েক কাপ চা না হলে তার অন্য খাবার দাবার-আবার হজমই হয় না তাও আবার বেশি করে দুধ দিয়ে চিনিসহ কড়া চা। এই বিষয়টি তিনি বিগত ৪০ বছর ধরে তার বউকে বুঝাচ্ছেন। আজ বাড়িতে বড় ধরনের একটা ঝামেলা হবে। সেটা হল তাদের মেঝ ছেলে বায়না ধরেছে আগামী সপ্তাহে নাকি বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাবে। তার জন্য ৮০০০ হাজারের মত কিছু টাকা দিতে হবে। কিন্তু পরমা ভাল করেই জানে কৃপণ নিমাই মাস্টার কিছুতেই এই টাকাটা দিতে চাইবে না। হাজারটা অজুহাত, উপদেশ এতেও যথেষ্ট না হলে রীতিমত ধমক দিয়ে ছেলে মেয়েদের ছোট-ছোট আবদার, চাওয়া-পাওয়াগুলোকে দমিয়ে রাখতে চায়। অর্থ থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা ছাড়া আর কোন বিষয়ে অতিরিক্ত খরচ করতে নিমাই মাস্টারের যেন মনের ভিতর অনেক বেগ পেতে হয়। কারণ তিনি গান, বাজনা, নাচ, খেলাধুলা, বাইরে বেড়াতে যাওয়া। এইসব কিছুকে সময় নষ্ট ও অর্থের অপচয় হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন। এমন কি বাড়িতে একটু করে ভাল-মন্দ, রান্না-বান্না করাকেও অপচয় হিসেবে ধরে নেন। তাই প্রায়ই তার স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে বোঝা পড়া হয়। বাড়িতে শুধুমাত্র অতিথি এলেই তিনি ভাল আয়োজন করার জন্য বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তিনি মানেন অতিথি হলেন নারায়ন। কিন্তু আজ আর বাবার কোন রকম ধমক বা ভয় নয়নকে পিছিয়ে দিতে পারবে না। বলতে গেলে বাবার সঙ্গে একরকম ঝগড়া করেই টাকাটা আদায় করবে। নিমাই মাস্টার প্রায়ই ৩৫ বছর ধরে একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে গণিত বিষয়ের উপর শিক্ষকতা করছেন। মাসিক আয় তার তেমন খারাপ নয়। শিক্ষকতার

পাশাপাশি বাড়িতে তিনি প্রায় ২০ জন ছেলেমেয়েদের পড়ান। তাদের কাছ থেকে তিনি কড়ায় গন্ডায় টাকা আদায় করেন মাস শেষ না হতেই। এর জন্য অনেক ছেলেমেয়েরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য শিক্ষক বেছে নিয়েছে যারা ঠিকমত পড়াও না। তাদের জন্য নিমাই স্যারের কোনরকম দুঃখ নেই বুকের ভিতর। কারণ তাদের সবার পরিবারের আর্থিক অবস্থা বেজায় ভালই বটে। স্বভাবে তিনি একটু কৃপণ হলেও মনটা কিন্তু খুবই নরম। গরীবদের প্রতি তিনি সর্বদা দয়ালু। প্রতি মাসের মাইনে থেকে কিছু টাকা গ্রামের গরীব ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য ব্যয় করেন যা তার সহধর্মীনি পরমা ও সন্তানেরা জানে না। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স পর্যন্ত পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছেন এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে। মেয়ের জামাই এক বিরাট বড় ডাক্তার। আর দুই ছেলে এখনও পড়াশুনা করছে। নিমাই অনেক কষ্ট ও সাধনা করে এত দূর এসেছে। ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি কখনও তার কৃপণতা দেখাননি। অত্র এলাকায় তার সন্তানদের মত শিক্ষিত এখনও কেউ হয়ে ওঠেনি। গণিতের উপর বহু বছর আগেই তিনি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। বলতে গেলে তার মত এত পারদর্শী এখনও কেউ হয়নি। নীতিতে তিনি বলীয়ান, বিচক্ষণ, সত্যবাদী আর সব ব্যাপারে অনেক দায়িত্ববান। জীবনে তিনি কখনও কোন ক্ষেত্রে অসৎ উপায় বা পন্থা অবলম্বন করেননি। অনেক সময় অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভাল ফলাফলের জন্য অগ্রিম প্রশ্ন হাতে পাওয়ার সুবিধার্থে অর্থের লোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায় বা পাপ কাজ করেননি। স্কুলে ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি তিনি সবসময় অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করেন যেন দুর্বল, অসহায়, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে মূল বিষয় বুঝতে পারে। ক্লাশে ও ক্লাশের বাইরে তিনি পড়ানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন এবং অনেক স্নেহ, ভালবাসা দেখান। কিন্তু পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে তার মত এত কঠোর শিক্ষক আর একজন নেই এই বিদ্যালয়ে। কোন একজন ভুল বা অস্পষ্ট হলেই তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টি কেটে দেন। তার বিষয়ে ভাল নম্বার উঠাতে ছেলেমেয়েদের অনেক রাত-দিন খাটতে হয়। পরীক্ষার খাতায় এত কড়াভাবে নাম্বার দেওয়ার জন্যই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা

(৯৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অসহায় মা

সিস্টার মিলন স্কলাষ্টিকা ক্রুশ এলএইচসি

স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ, প্রত্যন্ত অঞ্চল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিবেষ্টিত ছোট একটি গ্রাম। নাম তার আকাশতলী। গ্রামের মানুষদের মধ্যে রয়েছে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। তারা পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। এই গ্রামে বাস করে নিখিল ও নম্রতার পরিবার। তারা দুজন নিজেদের ইচ্ছায় ভালবেসে বিয়ে করেছে বলে মা-বাবা বাড়ি থেকে এমনকি তাদের নিজ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরিবার ও গ্রামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। তখন থেকেই তাদের আকাশতলী গ্রামে বসবাস।

নিখিল ও নম্রতা শুধু নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারে, তবে তাদের রয়েছে অনেক মেধা। সেই মেধা খাঁটিয়ে অনেক পরিশ্রম করে এবং গ্রামের লোকদের সহযোগিতায় আনন্দের সাথে ভালই চলছে তাদের। এক মেয়ে ও তিন ছেলে নিয়ে সংসার। মেয়েটি তাদের ভালবাসার প্রথম ফল সেই জন্য তারা মেয়েটির নাম রেখেছে প্রথমা। প্রথমা দেখতে খুবই সুন্দর, গোলগাল চেহারা, চোখ দুটো টানা-টানা আর হাসিতে যেন মুক্তা ঝড়ে, সবাই তাকে ভালবাসে। তারা চার ভাই-বোন খুব কাছাকাছি সময়ে হয়েছে বলে প্রথমা বাবা-মার খুব ভালবাসার হয়েও তাদের বেশি আদর-যত্ন পায়নি। মা-বাবা, ভাই-বোন সব মিলিয়ে ছয়জনের সংসারে অভাব যেন বেড়েই চলেছে। তাই বাবা-মা প্রথমাকে ছয় বছর বয়সে মিশন হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয় পড়াশুনা করার জন্য। প্রথমা খুব বুদ্ধিমতি, প্রতিদিন ক্লাশে যে পড়া দেয়, তা সে দিনের পড়া দিনেই শেষ করে ফেলে। প্রতি ক্লাশে সে প্রথম হয়। সেই জন্য স্কুলের শিক্ষকগণ ও মিশনের ফাদার-সিস্টারগণ তাকে খুব ভালবাসে। তার বাবা অনেক চেষ্টা করেও যেন তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পারছে না। প্রথমা যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা শুরু করেছে, তখন তার বাবা কাজের জন্য হোস্টেল থেকে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। প্রথমা কিছুতেই স্কুল-হোস্টেল ছেড়ে আসতে চায়নি, স্কুলের শিক্ষকদেরও এই ভাল ছাত্রীকে ছাড়তে কষ্ট হয়েছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, তাকে বাড়িতে আসতেই হলো, এখানেই তার পড়াশুনার ইতি, শুরু হলো প্রথমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়।

প্রতিদিন প্রথমা ঘুম থেকে উঠে পানি তোলে, ঘর-বাড়ি ও বাসন পরিস্কার করে, রান্না করে এবং বাবা-মায়ের সাথে জমিতে কাজ করতে যায়। মাঝে-মাঝে মায়ের সাথে ভাইদের দেখাশুনা করে। প্রথমার বয়স নয় শেষ হতে এক মাস বাকী। এত ছোট বয়সে নিখুত কাজ দেখে তার মা মহাখুশী, এখন মায়ের আর বেশি কাজ করতে হয় না, এরই মধ্যে মায়ের জীবনে একটা পরিবর্তন দেখা গেল, সে আর আগের মতো প্রথমাকে আদর করে না, যখন তখন রাগ করে এবং ঠিকমতো খাওয়া দেয় না। সারাদিন কাজের পর মাঝে মধ্যে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে প্রথমা।

প্রতিবেশীদের সাথে তাদের ভাল সম্পর্ক। একদিন পাশের বাড়ির নদীর মামা বিশ্ব তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে, বয়স ২৩ বা ২৫ বছর হবে। সে মাঝে-মধ্যে ছোট নদীকে নিয়ে প্রথমাদের বাড়িতে ঘুরতে আসে। প্রথমাকে দেখে তার ভাল লাগে এত কম বয়সে সুন্দর কাজ করা দেখে সে অবাক হয়। বিশ্ব প্রথমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়, প্রথমা সেটা বুঝতে পারে না। প্রথমার বাবা-মা যখন ঘরে না থাকে তখন বিশ্ব প্রথমার সঙ্গে দেখা করা ও কথা বলার সুযোগ নেয়, মাঝে-মধ্যে কাপড় ও নানা ধরনের সাজার জিনিসপত্র কিনে দেয়, কোলে নেয়, আদর করে। বিশ্বের সঙ্গে সময় কাটাতে প্রথমারও খুব ভাল লাগে, সে অপেক্ষায় থাকে, বিশ্ব কখন আসবে তাকে আদর করবে? কয়েকদিন থাকার পর বিশ্ব নিজ গ্রামে চলে যায়, তবে সে মাঝে-মধ্যেই আকাশতলীতে আসে এবং আসার সময় প্রথমাদের পরিবারের জন্য বাজার করে আনে, তা দেখ তার বাবা-মা অনেক আনন্দিত। বিশ্ব তাদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। প্রথমা ও বিশ্ব একসাথে সময় কাটালে তার বাবা-মা কিছু বলে না। বিশ্ব এই সুযোগে প্রথমার খুব কাছাকাছি আসে, তাকে স্পর্শ করে, প্রথমাও আনন্দ পায়। শিশু মনে জেগে উঠে ভালবাসা, বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভরতা। এভাবে তাদের কয়েক মাস চলে যায়। একদিন বিশ্ব প্রথমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে চলে আসে নিজের বাড়িতে। প্রথমা যখন বাড়ি থেকে চলে যায় তার বয়স মাত্র দশ বছর। বিয়ের সে কিছুই বুঝে না, তার শারীরিক তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ভালবাসায় সে এক অচেনা-অজানার পথে হাঁটতে আরম্ভ করে, বাবা-মা, ভাইদের পিছনে ফেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

প্রথমার দশ বছর বয়সে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়, নতুন জীবন। শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদ নিয়ে ভরা এ সংসার। সকালে স্বামী-স্ত্রী মিলে কাজ করার জন্য জমিতে যায় আর ফিরে আসে সন্ধ্যায়। হাসি-আনন্দে তাদের জীবন চলতে থাকে। প্রথমা নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝার আগেই তার কোল জুড়ে আসে তাদের প্রথম সন্তান। সন্তান আসার কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমার জীবনে নেমে আসে কষ্ট আর যন্ত্রণা। তার স্বামী আগের মতো তাকে আর ভালবাসে না, সে স্বামীকে কাছে পায় না, স্বামী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে। শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদও আগের মতো প্রথমাকে ভালবাসে না, এমনকি কোন কাজেও সহযোগিতা দেয় না। সংসারের সব কাজ প্রথমাকে একাই সামলাতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্না করে বাচ্চাকে নিয়ে জমিতে যায় এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে, এসে আবার রাতের রান্না করে। স্বামী সন্ধ্যার পর নেশা হয়ে বাড়ি ফিরে নানা কারণে বকাঝকা করে, মাঝে মধ্যে মারধর করে, কোন কথাই বলা যায় না। প্রথমা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না, এমন কি নিজের সন্তানকে ঠিকমত যত্নও করতে পারে না। বড় সন্তানের দেড় বছরের মাথায় দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। তাদের প্রথম সন্তান মেয়ে, এবার ছেলে হয়েছে। প্রথমা অনেক

খুশী কিন্তু তার স্বামীর মনে কোন আনন্দ নেই। বিশ্ব এখন কোন কাজ করে না, অলসভাবে ঘুরে বেড়ায় আর নেশা করে সময় কাটায়। তার স্বামী প্রথমার কাছে নেশা করার জন্য টাকা চায়, টাকা না পেলেই নানা নির্যাতন।

একদিন সকালে মেঘলা আকাশ দেখেও কোলের ছেলেকে রেখে অন্যের জমিতে কাজ করতে যায়। বিকালের দিকে বাড়ি ফেরার আগেই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়। একটি নদী পার হয়ে তাকে কাজে যেতে হয়েছিল, ফেরার পথে তার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি হেঁটে আগে চলে যায়। প্রথমার শরীর ছিল ক্লান্ত, মনে ছিল কষ্ট, ক্লান্ত শরীরে সঙ্গীদের সাথে হাঁটায় তাল মিলাতে না পেরে পিছনে পরে যায়। নদীর পাড়ে এসে দেখে নদীতে অনেক পানি এবং অনেক স্রোত। প্রথমা একা ছিল তাই সে খুব ভয় পেয়ে যায়, কিভাবে নদী পার হবে বুঝতে পারছিল না। অন্যদিকে তার মনে পড়ে গেল বাড়িতে তার দুধের শিশু রয়েছে, সে এখন কি করবে? বুঝতে পারছে না। তার শাশুড়ী বাচ্চাকে খাবার দিয়েছে কিনা, সে জানে না। বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসায় সে অস্থির হয়ে যায়, সে প্রায় উন্মাদের মত নদীতে ঝাঁপ দেয়। অনেক কষ্ট করে, সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে উপরে ওঠে দেখে তার গায়ে ব্লাউজ ছাড়া আর কোন কাপড় নেই, পাতা দিয়ে নিজের লজ্জা নিবারণ করে অনেক রাতে বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়িতে এসে দেখে তার আদরের দুই সন্তান কাঁদতে-কাঁদতে নীল বর্ণের হয়ে গেছে। মেয়ে কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা শব্দে বলল, সে ও ভাই সারাদিন কিছুই খায়নি। দাদী ও পিসিমার কাছে খাবার চেয়েছে, কিন্ত তারা কোন খাবারই দেয়নি, উল্টো তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির জন্য অন্যকোন ঘরেও তারা যেতে পারেনি। এমন সময় তার স্বামী এসে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো, "কোন বেটার সাথে সময় কাটিয়ে এত রাতে বাড়ি ফিরলি" বলে মারতে শুরু করলো। প্রথমা স্বামী কথার উত্তর না দিয়ে রান্না করার জন্য রান্নাঘরে গেল। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে চালের ভারে একটুও চাল নেই। সে কি করবে বুঝতে পারছে না? অনেক খুঁজে তিনটে আলু পেলো, তা সিদ্ধ করে ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে, নিজে পানি খেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমাতে গেল।

প্রথমার স্বামীর কেন এই পরিবর্তন, পরিবারের প্রতি কেন এত উদাসীন? সেটা খুঁজতে গিয়ে জানা গেল প্রথমাকে বিয়ে করার আগে তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছিল। সেটা প্রথমাকে জানানো হয়নি। এখন সেই স্ত্রী তার সাথে যোগাযোগ করছে, মাঝে মধ্যে স্ত্রীর জন্য টাকা পাঠায় আর সুযোগ বুঝে স্ত্রীর কাছে যায়। তাই প্রথমার প্রতি তার এই উদাসীনতা। এখন আরও বেশি সে নানা অজুহাতে প্রথমার সঙ্গে ঝগড়া করে, মারধর করে এবং যখন-তখন তার সাথে মিলন করতে চায়। তার ইচ্ছা পূরণ না হলে সংসারে অশান্তি করে। শ্বশুর-শাশুড়ীও নানা মিথ্যা কথা বলে ছেলেকে আরো বেশি রাগিয়ে তোলে, ফলে অত্যাচার বেড়ে যায়।

একদিন নিজের জমির কাজ শেষ করে বাড়িতে এসে দুপুরের রান্না করছে। এমন সময় তার স্বামী নেশা অবস্থায় বাড়িতে এসে এক কথা, দু'ই কথায় ঝগড়া শুরু করে দেয়। বিশ্ব রাগ করে লাথি মেরে তরকারীর পাতিল মাটিতে ফেলে দেয় এবং সেই পাতিলের উপর প্রথমাকে ফেলে দিয়ে মারতে শুরু করে। এইদিকে প্রথমার গায়ে যে ব্লাউজ ছিল তা পুড়ে গিয়ে গায়ের সাথে লেগে যায়, আর তার বুকের বাম পাশ পুড়ে যায় এবং ব্লাউজ খুলতে গিয়ে গায়ের চামড়া উঠে আসে। প্রথমার শ্বশুর বাড়ির কেউ আসেনি তাকে সাহায্য করতে। প্রথমা একা-একা বসে কাঁদতে থাকে। মায়ের কান্না দেখে ছেলেমেয়েরাও পাশে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। প্রতিবেশিরা অদূরে দাঁড়িয়ে সব দেখে ও কেউ সাহস ক'রে এগিয়ে আসে না, তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালির ও অপমান হওয়ার ভয়ে। প্রথমা দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সমাজের মাতব্বরদের কাছে বিচার চায়। মাতব্বরেরা তার স্বামীর পক্ষ নিয়ে বিচারে রায় দেয়, তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাকে স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে হবে। স্বামীর কাছে তার নিজের ও সন্তানদের জন্য কোনকিছু দাবী করতে পারবে না।

পরের দিন প্রথমা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যায়। তার বাড়িতে ফিরে আসা বাবা-মা, ভাই ও ভাইয়ের বৌ ভাল দৃষ্টিতে দেখেনি। প্রথমা বাবার বাড়িতে এসে যেন আরো বড় ভুল করে ফেলেছে এবং বড় বিপদের মধ্যে পড়েছে। বাবা-মা প্রথমাকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে বলে ভাই মা-বাবাকে ভরণপোষণ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। জীবনে আর এক নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে। নিজের বাবা-মায়ের ও নিজের সন্তানদের জন্য পেটের দায়ে অন্যের জমিতে দিন মজুরের কাজ করে টাকা উপার্জন করা, যেন পরিবারের সবাই তাকে ভালবাসে। সে অতীতে যেমন বর্তমানেও কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। সে শুধু নিজের গ্রাম ও স্বামীর গ্রাম ছাড়া অন্য কোন গ্রাম দেখেনি। তার নিজের জীবনে আনন্দ বলতে যেন কিছুই নেই। আনন্দের ও সান্ত্বনার একটি মাত্র জায়গা আছে আর তা হলো তার দুই সন্তান। প্রথমা শুধু নিজের বাড়ি ও জমিতে কাজ করে তার জীবন অতিবাহিত করছে।

আমাদের সমাজে এখনো এই চিত্র প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। সরকার ও সমাজ বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য কত আইন-কানুন তৈরী করছে। তবুও এই চিত্র আমাদের সমাজে রয়েছে। নারীরা এখনো অনেক অবহেলিত, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত। আমাদের মা-বোনেরা কি এভাবেই আজীবন হবে? এর প্রতিকার কি কোনদিন হবে না? নেশা নামক করাল গ্রাসের থাবা থেকে সমাজ কি রক্ষা পাবে না?

যিশুর সাথে বন্ধুত্ব

আন্তনী বর্ণ ক্রুশ

যিশুর সাথে বন্ধুত্ব
তিনি দেবেন সবাইকে আনন্দ,
বন্ধুত্বের কোন শেষ নেই
যিশুর সাথে একটু খেলে নিই।
তাঁর সাথে বন্ধুত্বে অনেক লাভ
যিশু কোনদিন দেবে না পাপ,
বন্ধুত্ব মানে অনেক ভালোবাসা
বিপদে পড়লে তিনি দেবেন আশা।
যিশুর সাথে বন্ধুত্ব করতে লাগে
না পয়সা
যিশু তোমার মনকে দেবে
সুন্দর নকশা,
বন্ধুত্ব মানে রাগ, হিংসা কিছু নেই
বন্ধুত্ব মানে এই নয় যে, যিশু নেই।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন।

বড়দিনের আনন্দ মুহূর্তে দিক আমাদের সবার মনের কালিমা, নববর্ষ বয়ে আনুক অফুরন্ত সম্ভাবনা।
সবাইকে লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর পক্ষ থেকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি

পঙ্কজ পিটার গমেজ
চেয়ারম্যান

দীপক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
ভাইস-চেয়ারম্যান

রিপন জেমস কস্তা
সেক্রেটারী

সজল জেমস্ রোজারিও
ম্যানেজার

প্যাট্রিক স্বপন গমেজ
ট্রেজারার

বিকাশ পলিনুস কোড়াইয়া
ডিরেক্টর

রিন্টু থিওটোনিয়াস গমেজ
ডিরেক্টর (কো-অপ্ট)

সুমন লেনার্ড রোজারিও
ডিরেক্টর

দোলন প্লাসিড গমেজ
ডিরেক্টর

মাইকেল অনিমেষ গমেজ
ডিরেক্টর

সুমন গ্রেগরী গমেজ
ডিরেক্টর

জুয়েল গাব্রিয়েল রোজারিও
ডিরেক্টর

ক্রেডিট কমিটি →

সিলভেষ্টার পালমা
চেয়ারম্যান

টনী গডফ্রে গমেজ
সেক্রেটারী

এডঃ রেবেকা পলিনা গমেজ
সদস্য

সুপার-ভাইজরী কমিটি →

প্রদীপ আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান

মিঠু রোজারিও
সেক্রেটারী

অপু বার্ণাড গমেজ
সদস্য

অফিস ষ্টাফ

নমিতা বিশ্বাস
হিসাবরক্ষক

অসীম বি. পালমা
কালেক্টর

প্রমি আন্তনী কোড়াইয়া
ছাত্র প্রকল্প

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

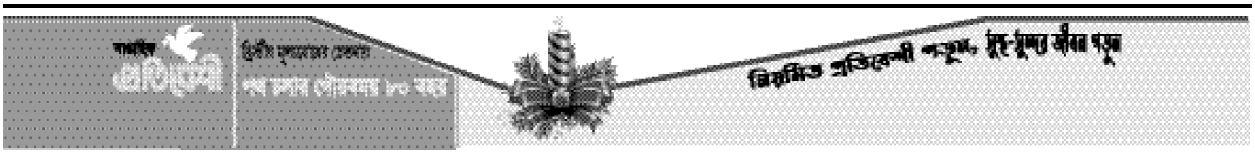
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

দ্বাবিংশ মৃত্যুবার্ষিকী

'আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। খ্রিষ্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে ধরে রেখেছি'। - ২য় তিমথি ৪:৭

প্রয়াত এলিজাবেথ শেফালী গমেজ
জন্ম : ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা, ঢাকা

মৃত্যু : ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নিউ জার্সি, ইউএসএ

পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছ আমাদের একা করে বহুদূরে। বছরান্তে আবার ফিরে এসেছে সেই বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৯ অক্টোবর, যেদিন তুমি চলে গেছ আমাদের ছেড়ে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গীয় চিরশান্তি দান করুন।

শুভ বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শোকাহত পরিবারবর্গ

স্বামী : রবার্ট গমেজ (আদি)
সন্তানগণ : ফাদার ষ্ট্যানলী, জেমস্-সুইটি, জেভিয়ার-তুলি, অলড্রিন-ন্যান্সি, জুয়েল-লতা, মাইকেল-মনি ও লোয়েল-চৈতি।
নাতি-নাতনী : এলিজাবেথ মণিকা, রবার্ট যোনাস, খ্রীষ্টফার নিকোলাস, এড্রিয়া সুজানা, যোয়ানা ভিক্টোরিয়া, যোনাথন রিচার্ড এবং এইডেন খৃষ্টান গমেজ (আদি)।

আমেরিকার একমাত্র বাঙালি যাজক
ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ (আদি)
শুধুমাত্র গোল্লা ধর্মপল্লীর গৌরব নয়
গোটা বাংলাদেশের গৌরব।

যাজকীয় অভিষেকের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বাবা ও স্বর্গীয়া মা'র আশির্বাদ ও ছোট ভাই ও বউদের এবং ভাতিজা-ভাতিজিদের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা রইল।

শুভেচ্ছান্তে –
বাবা : রবার্ট গমেজ (আদি)
ও পরিবারবর্গ
আদির বাড়ি
ছোট গোল্লা, গোল্লা ধর্মপল্লী
New Jersey USA

বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

স্মৃতিতে তোমরা অমর

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত শিশিলিয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত বেনজামিন রোজারিও
জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : বেওন, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত ইউফ্রেজী রেনু রোজারিও
জন্ম : ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত পিটার রোজারিও
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : কাজীর বাড়ি, বক্সনগর, ঢাকা
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : জার্সি সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ

তোমাদের স্মরণে

কালের বিবর্তনে এতোগুলো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো যে, তোমরা আমাদের ছেড়ে সেই অনন্ত পরপারের উদ্দেশে ভাসিয়েছো ভেলা। যদিও তোমরা আমাদের হৃদয়মাঝে সদা বিরাজমান, তবুও প্রতিবার বছরের এ সময়টা আমাদের মনকে ভীষণ বেদনাবিধুর ও হৃদয়কে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে তোলে। তোমাদের হারানোর ব্যথা ও না পাওয়ার দুঃখ এ সময়টায় যেন আমাদের হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে ওঠে। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সবাইকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবুও অবুঝ মনটা তো আর মানতে চায় না। তাই নানান অজুহাতে মনটাকে প্রবোধ দিয়ে জীবনপথে চলতে হয়। তোমাদের সেই সব সুখ-স্মৃতি, সুখ সান্নিধ্য ও আদর আমাদের ঐ দুঃখ-বেদনা ও শূন্যতাকে ভরে রাখে এবং আমাদের মানসপটে ভেসে আসা তোমাদের অনিন্দ্য-সুন্দর সদাহাস্য মুখোজ্জ্বল আমাদের হৃদয় ও মনকে করে আলোকিত ও আনন্দিত। তোমরা তো ভোলার নও - তোমরা চির অমর - চিরস্মরণীয়।

আমাদের ভাবনায়, চেতনায় ও অনুভূতিতে তোমরা সদা জাগ্রত। তোমাদের আদর্শ ও নিষ্ঠা যেন আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে সর্বক্ষণ আমাদের পথ প্রদর্শন করে; অমৃতলোক থেকে তোমরা আমাদের সেই আশীস দান করো।

পরম করুণাময় যেন তোমাদের তাঁর শান্তির রাজ্যে চিরশান্তি ও সুখ দান করেন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
শান্তি ভবন
বেওন, নিউ জার্সি, ইউএসএ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সিস্টার মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুন্দর-সুন্দর জীবন গড়ুন

প্রয়াত পিটার রোজারিও
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত আইরিন গমেজ
জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

In loving memory of Irene Gomes

On Sunday, May 3, 2020, **Irene Gomes,** loving mother, grandmother, and great-grandmother, passed away at the age of 84.

Irene was born on July 7, 1935 in Dhaka, Bangladesh to Lawrence and Romona Gomes, eldest of four girl On February 8, 1950, she married to **Peter Gomes.** They raised two sons, Manuel and Christopher, and three daughters, Veronica, Elizabeth, and Teresa.

Irene was an exceptional wife and stay-at-home mom, always caring for her loved ones. She migrated to the United States on October 31, 1981 and settled in New York, and later in Jersey City, New Jersey. She always looked forward to visiting her family in Bangladesh.

It was a gift that our mom was able to visit Bangladesh earlier in 2020 and spend some time with 3 of her children, two younger sisters, other relatives, friends and neighbors in the village that she loved.

Irene was preceded in death by her husband, Peter. She survived by her five children: Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa, and Christopher, her sisters Rose Bernadette and Veronica, eight grandchildren: Joseph, Peter, Jane, June, Kenneth, Ryan, Kyle, and Andrew, four great-grandchildren: Benjamin, Samantha, Alyssa, and Mars, and several in-laws, cousins, nieces, and nephews.

Thank you all for your prayer, kind words and support to our family during this difficult time. We are grateful from the bottom of our hearts. May our mom Irene and dad Peter Gomes rest in peace with God.

With love,
Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa and Christopher.

স্মৃতিতে তোমরা

আমাদের স্নেহময়ী মা, ঠাকুরমা ও প্রমাতামহ **আইরিন গমেজ** গত ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রবিবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আইরিন গমেজ বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বক্সনগর গ্রামে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দর ৭ জুলাই, লরেন্স ও রমনার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। চার কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি পিটার গমেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঈশ্বর তাদেরকে দুইজন ছেলে- ম্যানুয়েল ও খ্রীষ্টফার এবং তিনজন মেয়ে– **ভেরোনিকা, এলিজাবেথ এবং তেরেজাকে** দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

আইরিন গমেজ ছিলেন একজন কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ত স্ত্রী এবং একজন আদর্শ গৃহিনী ও আদরের মা। তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর আমেরিকাতে আসেন। তিনি প্রথমে নিউইয়র্কে এবং পরে নিউ জার্সির জার্সি সিটিতে বসবাস করেন। বাংলাদেশ ও ফেলে আসা আত্মীয়দের প্রতি ছিল তার প্রবল টান। তাই সময় সুযোগ হলেই তিনি পাড়ি জমাতেন সুদূর বাংলাদেশে।

২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে তিনি সুযোগ পেয়ে যান এই বাংলাদেশের এবং তার একান্ত আপনজনদের সান্নিধ্য লাভের। তিনি তার তিন ছেলে-মেয়ে, দুই বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে অনেক সুন্দর, সুখময় সময় অতিবাহিত করেন বাংলাদেশে।

আইরিন গমেজের স্বামী পিটার গমেজ স্বর্গবাসী হন বেশ কিছু বছর আগে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তার পাঁচ সন্তান, দুই বোন, আট নাতি-নাতনি, চার পুতি-পুতিন এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব।

যারা আমাদের শোকার্ত পরিবারকে এ কঠিন দুসময়ে প্রার্থনা, পরামর্শ ও সহানুভূতি দিয়ে সান্ত্বনা ও সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। করুণাময় ঈশ্বর যেন আমাদের মা আইরিন গমেজ ও বাবা পিটার গমেজকে চিরশান্তি ও চিরসুখ দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

- ভেরোনিকা শোভা রোজারিও
- ম্যানুয়েল বাবুল গমেজ
- এলিজাবেথ সন্ধ্যা গমেজ
- তেরেজা জ্যোৎস্না গমেজ
- খ্রীষ্টফার টিলু গমেজ

বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

স্মৃতিতে চির ভাস্বর স্মরণীয়-বরণীয় যিনি

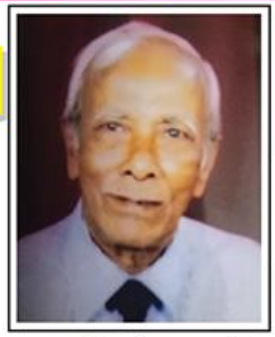

ইলারিয়াস রোজারিও(এলু)
জন্ম: ১৯ মে, ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

তেজগাঁওয়ের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজ ও সমবায়ী সংগঠক এবং প্যারিসের প্রতিষ্ঠাকালীন কাউন্সিলর ইলারিয়াস রোজারিও'র প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধাভরে।

ইলারিয়াস রোজারিও বর্তমান সাতরাস্তা সংলগ্ন সিএসডি খাদ্য গুদাম এলাকায় তৎকালীন ফ্রেঞ্চ গার্ডেন, মিশনভিত্তিক নাম 'পুব পাড়া'য়- বর্তমান দক্ষিণ বেগুনবাড়িতে ১৯ মে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কেতু ফ্রান্সিস রোজারিও এবং মাতা মাগ্দেলেনা রোজারিও। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তেজগাঁও কাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ব্রাদার ইউজিন সিএসসি'র তত্ত্বধানে। লাতিন মিসার সেবক হতে ব্রাদার ইউজিনের কাছে লাতিন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যা আমৃত্যু ভরাট গলায় শুনিয়ে গেছেন। ধর্মীয় পার্বণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তীর্থভূমি তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লী।

উৎসব পার্বণে পাড়াভিত্তিক নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কীর্তন যেন আগে থেকেই প্রবাহিত। কাথলিক মণ্ডলীর মূল্যবোধে ও শিক্ষায় শৈশব থেকেই এ সব কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। পলিটেকনিক হাই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি তেজগাঁওভিত্তিক ক্লাব ও সমবায় কর্মকাণ্ডে যোগ দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের কারণে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ভেঙ্গে ভারত-পাকিস্তান এর জন্ম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সর্বোপরি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই তেজগাঁওয়ের খ্রিস্টান জনবসতি উচ্ছেদের প্রথম শিকারকালীন উত্তাল সময়ে তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন। স্থানীয় কাথলিকদের মধ্যে প্রথমদিকে ম্যাট্রিক পাস করায় তখনকার রীতিতে অনেকেই তাকে দেখতে এসেছিলেন বাড়িতে। তবে জীবিকা ও অন্যান্য কারণে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু তার সন্তানদের সুশিক্ষিত করার মাধ্যমে সে অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছেন। ম্যাট্রিক পাসের তিন বছর পর তিনি আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে চাকুরিতে যোগ দেন এবং সফল অবসর জীবন যাপন করেছেন।

বিশিষ্ট নাট্য ও অভিনয় শিল্পী ইলারিয়াস রোজারিও তেজগাঁও অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন 'খান' নামে। তেজগাঁওয়ে বহুবার মঞ্চস্থ 'ঈশা খান' নাটকে ঈশা খান চরিত্রে অভিনয় প্রিয়তার কারণে স্থানীয় নাট্য দর্শকদের এবং সুহৃদ মহলে 'খান' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। বিগত শতাব্দীর ষাট, সত্তর এবং আশির দশকে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নাগরী, হাসনাবাদ ও গোল্লার বিভিন্ন মঞ্চে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক ৫৪টি নাটকে অভিনয় করেন তিনি।

ক্রীড়াবিদ ইলারিয়াস রোজারিও ফাদার জে ইয়াং প্রতিষ্ঠিত তেজগাঁও ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম সংগঠক, খেলোয়াড়, লাইন্সম্যান ও রেফারি হিসেবেও সুনাম কুড়িয়েছেন তিনি। তিনি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বোয়ালী গ্রামের জর্জ গমেজ ও জীতা কস্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ফাদার জ্যোতি এ গমেজের বোন বেলা মেরি স্টেল্লার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইলারিয়াস ও বেলা মেরি স্টেল্লার দাম্পত্য জীবনে প্রথম সন্তান আসে দীর্ঘ ৫ বছর পর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রার্থনাশীল এই পরিবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর ইতিহাসে স্থানীয় খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে অন্তত ১ জনকে প্রভু যিশুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার পুরোহিত দানের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। অতপর সেজো সন্তান প্রমোদ থিওফিল রোজারিওকে ব্রাদার এবং কনিষ্ঠ সন্তান প্রবাস পিউস রোজারিওকে জেজুইট যাজক পদে উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এতদিন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, এখন নেই, কিন্তু তবুও আমরা জানি, তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষত তার সহধর্মিনী বেলা রোজারিও, সন্তান-সন্ততিসহ শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে তার আদর্শে বেঁচে থাকবেন। পরম পিতার বক্ষে খ্রিস্টেতে তার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

বেলা মেরী স্টেল্লা রোজারিও
সহধর্মিনী

সন্তানগণ

প্রভাতী গের্ট্রুড রোজারিও, বাদল কোড়াইয়া (জামাই)
প্রফুল্ল পিনুস রোজারিও, ভেরোনিকা কস্তা (পুত্রবধূ)
প্রণয় পলিকার্প রোজারিও, জেইন প্যাট্রিসিয়া গমেজ (পুত্রবধূ)
ব্রাদার প্রমোদ থিওফিল রোজারিও সিএসসি
প্রমিলা বার্নাডেট রোজারিও, সুমন পিরিজ (জামাই)
ফাদার প্রবাস পিউস রোজারিও এস জে
প্রতিভা ভেরোনিকা রোজারিও, সনি রোজারিও (জামাই)

নাতি-নাতনি

কুঞ্জন কোড়াইয়া, মৌসুমী(নাত বৌ), পৃথা অতন্দ্রিলা, সুমন (নাতিন জামাই), প্রৈতি, সান্দ্র প্রাতঃ, অস্মিতা, প্রেয়া, স্তুতি, শ্রেষ্ঠ, স্পন্দন, পুত্রি : প্রাচুর্য ও প্রাচ্য

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম ...."

জর্জ দেবল ডি'ক্রুজ

জন্ম : ৬ নভেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে
মৃত্যু : ২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে

আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবা **জাদুকর জর্জ দেবল ডি'ক্রুজ** এই জগৎ ছেড়ে গত ২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসারত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সকাল ৯:২৮ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, পাঁচ কন্যা ও জামাতা, দুই পুত্র ও পুত্রবধু, তেরোজন নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। বিখ্যাত এই জাদুশিল্পী জর্জ ডি'ক্রুজ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার শুলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিকোলাস ভুবন ডি'ক্রুজ ও মাতা এমিলিয়া ডি'ক্রুজ। তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে রেখা লুসি ডি'ক্রুজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি বান্দুরা হলিক্রস স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন এবং পরবর্তীতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। যদিও তার কর্মজীবন শুরু হয় গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক থেকে কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ম্যাজিকের প্রতি তার তীব্র ঝোঁক এবং আগ্রহই তাকে পরবর্তীতে করে তোলে একজন প্রসিদ্ধ জাদুশিল্পী।

জাদুশিল্পী হিসেবে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দূতাবাস এবং দেশ-বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শন করে অগণিত মানুষের মন জয় করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ জাদুকর পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি, "International Brotherhood of Magician" - এর সহ-সভাপতি। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি কালব্-এর প্রতিষ্ঠাতা বোর্ডের ডিরেক্টর ছিলেন (১৯৭৯ - ১৯৮২)। তিনি কালব্ গঠন ও ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্প্রসারণে অসামান্য অবদান রেখেছেন। এছাড়াও তিনি দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিমিটেডের সেক্রেটারী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট, মনিপুরী পাড়া খ্রিস্টান সমাজের প্রেসিডেন্ট এবং আমৃত্যু উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যদিও তিনি শারীরিকভাবে আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গ থেকে বাবা প্রতিনিয়ত আমাদের দেখছেন, পাশে আছেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায় এবং খ্রিস্টযাগের পর তেজগাঁও কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। আমাদের এই সংকটপূর্ণ সময়ে যারা আমাদের সাথে ছিলেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বর্গে চিরশান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে-
তাপস নিকোলাস ডি'ক্রুজ
ও
অপু পিটার ডি'ক্রুজ
মনিপুরীপাড়া, ঢাকা

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বাবা / দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ী

মঠবাড়ী মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি – আর কোনদিন তোমায় দেখতেও পাবো না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে – মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায় - তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে - নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো বড়দিনের ও শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য -
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা -
ঐশী, যাকোব, অর্ঘী, অস্থী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অম্বে, অবনী, রাহুল, মার্সিয়া ও স্যাম।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অভিনন্দন

একজন প্রকৃত সমাজসেবক যিনি তার সাধ্য ও সামর্থের মধ্যে তাঁর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। সাধারণ আটপৌড়ে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এবং ঢাকা মহানগরে সফল নেতৃত্বদানকারীর মত বিশাল কর্মযজ্ঞ হয়তোবা নেই কিন্তু তাঁর ছোট্ট কর্মক্ষেত্রের সাধারণ এবং অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতাই তাঁর কাজের প্রকৃত অনুপ্রেরণা। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ হিসেবে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শহরের জৌলুসময় নেতৃত্ব তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করেনি বরং গ্রাম্য ছোট্ট ক্ষেত্রে তিনি এঁকেছেন সুন্দর ও সততার আল্পনা। গোল্লা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত, দীর্ঘ ৩৫ বছর নয়নশ্রী ইউনিয়নের মেম্বার এবং একজন পল্লী চিকৎসক হিসেবে যে কোন সময়ে, দিনে রাতে যে কোন মুহূর্তে সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়ে যিনি পাশে থাকেন, তিনি সবার **টমাস' দা**- গোল্লা ধর্মপল্লীর চৌড়া বাড়ির টমাস রোজারিও। নিজ পরিবার এবং সাথে সাথে বর্ধিত পরিবারের সবার প্রতি তার অসীম মমতায় এবং দক্ষতায় সবাইকে সহায়তা করার আন্তরিক প্রয়াসেই কারো কাছে টমাস কাকা, টমাস মামা, টমাস জ্যাঠা, টমাস মেসো, টমাস পিসা, টমাস আঙ্কেল। খ্রিস্টমণ্ডলীতে তাঁর এই বিশেষ সেবাদানের জন্য **টমাস রোজারিও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রদত্ত পোপীয় সম্মাননা "The Cross Pro Ecclesia et Pontifice ("Cross of Honour")" ভূষিত হয়েছেন।** সম্মাননা মেডেল ও অভিজ্ঞান পত্রটি গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে টমাস রোজারিও এর হাতে তুলে দেন পোপের প্রতিনিধি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তৎকালীন মহামান্য আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং পরম শ্রদ্ধেয় সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। মহান সৃষ্টিকর্তা এবং সেই সাথে সাধারণ মানুষের কাছে টমাস' দা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যারা সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা। ঈশ্বর যেন তাঁর এই সেবককে দীর্ঘায়ু জীবন ও সুস্বাস্থ্য প্রদান করেন।

– পরিবারবর্গ

সু-খবর! সু-খবর! সু-খবর!

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

সমিতির সদস্যদের আবাসনের কথা চিন্তা করে
ঢাকার প্রাণকেন্দ্র তেজগাঁও-এর পূর্ব তেজতুরীবাজারে
আবাসন-৮ প্রকল্পটির কাজ শুরু হচ্ছে

বারি স্টুডিওর গলিতে এবং নর্দান ইউনিভার্সিটির পেছনে অবস্থিত
১০০/১, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও-এ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা সহ
১১৮০-১২৭৫ বর্গফুটের ডাবল ইউনিট

আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট কিনুন

এ সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

বিস্তারিত জানতে কল করুন
০১৭০৯৮১৫৪১৫
০১৭১৫২৬৭৮৩৩

সরাসরি যোগাযোগের জন্য
রিয়েল এস্টেট বিভাগ
রেভা: ফা: চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ৫ম তলা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৬২ দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, দুই-দুলের জীবন গড়ুন
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিয়ের পাত্র

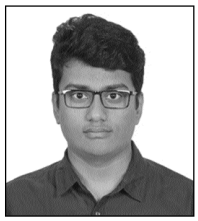

জ্যাকব ডি'রোজারিও

বড় বোনের বাসায় ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। একদিন আগে যে বাসার পরিবেশ হৈ হাঙ্গামায়, হাসি-ঠাট্টায় আনন্দময় দেখে এসেছি আজ দেখি একদম বিমর্ষ। কেমন যেন মনমরা হয়ে ভাগ্নে-ভাগ্নিরা একেকজন একেকদিকে বসে আছে। ছোট ভাগ্নে রিকি দরজা খুলে স্বভাবসুলভ "মামা আসছে" বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। দরজা খুলে হাসল ঠিকই কিন্তু কোন কারণে যে মন বেজার তা ঠিকই বোঝা গেল। ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম, কি রে বাসার এই অবস্থা কেন, বিয়ে বাড়িতে ঢুকছি? নাকি মরাবাড়িতে?

বিয়েবাড়ি বলছি কারণ বড় ভাগ্নিটার বিয়ে সামনের মাসেই। বিয়ের এক মাস দেরী থাকলেও, পানমাছের বাকি মাত্র দুদিন। তাই গতকালই এসে বড়দির কাছ থেকে কাজের ফিরিস্তি নিয়ে গিয়েছিলাম। একগাদা জিনিস কেনার লিস্ট ধরিয়ে দিল। তার সিংহভাগই কিনে হাজির হলাম আজকে। কিন্তু বাসার এ অবস্থা দেখব তা তো ভাবিনি। আগেরদিন দেখে গেলাম কে কি পরবে, কিভাবে সাজবে, কে কিভাবে ছবি তুলবে তা নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা। আর আজকে সবাই বিমর্ষ হয়ে পরে আছে। ছোট ভাগ্নি পিঙ্কিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি রে এই অবস্থা কেন তোদের।

"অরূপ দাদার কথা কে কি যেন বলেছে কাকাকে।"

"অরূপ দাদা আবার কে?"

"ধুর মামা, বড়দির বিয়ে হচ্ছে তো অরূপ দাদার সাথেই।"

"ওহ, তাই বল। দুলাভাই বল, নাম টাম আমার খেয়াল আছে নাকি। তা কি বলেছে তোর কাকাকে?"

"বলেছে অরূপ দাদা নাকি পড়াশুনা করেনি, ইন্টারও পাশ করেনি।"

"কেন, ও না ইস্ট-ওয়েস্ট থেকে বিবিএ করেছে?"

"আমরাও তো তাই জানতাম, কিন্তু এখন তো এগুলো বলল।"

"কে বলেছে এগুলো?"

"তা জানি না, তুমি মাকে জিজ্ঞেস কর।"

"কই তোর মা কই?"

"মাআআআআআ, এই যে মামা আসছে তো।" এই বলে চিৎকার দিয়ে পিংকি ঘরের ভিতরে চলে গেল।

এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই বড়দি এসে ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, "বড়দি, প্যাঁচ নাকি লাগিয়ে দিয়েছ একটা।" বড়দি বলল, "কি যে অবস্থা, আমি কোন দিশে পাচ্ছি না। দেখ, সুমনকে ফোন করে কে যেন বলেছে অরূপ নাকি ইন্টারও পাস করেনি। ইস্টওয়েস্ট এ বিবিএ পড়েছে এটা নাকি পুরাই ভুয়া। কোন কোর্স নাকি করেছে।"

"কেন সে না চাকুরি করে?" জানতে চাইলাম আমি।

"করে তো কোন একটা বাইং হাউস এ। এখন কি যে করে ওখানে তা তো ঠিক জানতাম না। আগে তো ভেবেছিলাম, বিবিএ করে যেহেতু ঢুকেছে ভাল কিছুই করে হয়তো। কিন্তু এখন তো সব ওলট-পালট হয়ে গেল।"

"ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছ?"

"হ্যাঁ রিংকি করেছে, অরূপ তো অনেক রিঅ্যাক্ট করেছে শুনে, এসব আজে-বাজে কথা শুনে কেন বিশ্বাস করছি আমরা, লাগলে নাকি সার্টিফিকেট দেখাবে।"

"তো দেখাতে বল না।"

"আরে রিংকিকে দিয়ে তো জিজ্ঞেস করতেই অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো লেগেছে, রিংকি বলে দিয়েছে সার্টিফিকেট চাইতে পারবে না আর।"

"কিন্তু বলেছে টা কে এই কথা?"

"তাই তো বুঝতে পারছি না। সুমন কে পরিচয় দেয়নি ঠিকমত।"

"তাহলে কে না কে বলেছে, ভুয়াই হবে, পাত্তা দেয়া লাগবে না।"

"কিন্তু দেখ আসলেও তো ছেলেটার পড়াশোনার ব্যাপারটা কখনোই ঠিকমত শুনিনি। আর রিংকির ফ্রেন্ড আছে ইস্ট-ওয়েস্ট এ। ওই ও ওকে দেখেনি কোনোদিন।"

"আরে ভার্সিটিতে কত স্টুডেন্ট থাকে, সবাইকে দেখা যায় নাকি। আর ও সিনিয়র না অনেক।"

"তা ঠিক, কিন্তু দেখ নিশ্চিত না হতে পারলে শান্তি হচ্ছে না।"

"ওদের কারো সাথে কথা বলেছে, ওর মা কে একটা ফোন দাও?"

"ফোন দিব কিন্তু পরে যদি আসলেই এটা ভুয়া হয়, পরে ওরা যদি কিছু মনে করে। আমার মাথাই কাজ করছে না, কি যে করি।"

"আরে ফোন দিয়ে কথা বলে সব ক্লিয়ার করে নিলেই ভাল, ওনাদের কে তো ভাল বলেই মনে হল সেদিন।"

পাশের ঘরে ফোন বেজে ওঠার শব্দ হল তখনই। রিকি ফোনটা এনে মার হাতে দিল, "অরূপের মাই ফোন দিয়েছে।" "এই তো ভাল হয়েছে", খুশি হয়ে বলে উঠলাম আমি, "এবার কথা বলে ক্লিয়ার করে নাও সবকিছু।"

বড়দি নমস্কার দিয়ে কথা শুরু করল। একপাশের কথা শুনে কিছু বোঝা যাচ্ছে না কি কথা হচ্ছে, বড়দির দিক থেকে শুধু হু-হ্যাঁ উত্তরই যাচ্ছে। তাই আর শোনার চেষ্টা না করে উঠে ভিতরে ভাগ্নীদের রুমের দিকে গেলাম। দেখি রিংকি বিছানার এক কোনে বসে মোবাইল টিপাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কান্নাকাটি করেছে। কাছে গিয়ে বললাম, "কিরে রিং, গেঞ্জাম নাকি লেগে গেছে।"

"দেখ না মামা, কি শুরু করেছে মা রা সব। কে না কে ফোন দিয়ে সুমন কাকাকে কি না কি বলেছে আর মা'রা সবাই একদম হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে। অরূপরা মোটেই ওইরকম না। ওরা মিথ্যা বলবে কেন।"

"বাপরে, বিয়ের আগেই জামাই এর পক্ষে চলে গেছিস। আচ্ছা ভালই ভালই। কিন্তু তুই ঠিক জানিস তো, ঠিক বুঝেছিস তো ওকে?"

"হ্যাঁ মামা।" মুখ নামিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল রিংকি, "অরূপ অনেক ভাল।"

"তুই বুঝলেই হল, আমি দেখছি সব, চিন্তা করিস না।"

মুখ তুলে আশাভরা চোখে তাকিয়ে রিংকি বলল, "হ্যাঁ, একটু দেখ না মামা প্লিজ, মা যে কেমন করছে।"

এমন সময় বড়দি এসে ঢুকল ঘরে। "কি কথা হল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"অনেক কিছু তো বলল। আমরা কিভাবে এরকম কথা বিশ্বাস করতে পারি। কত মানুষ কত কিছু বলে সব শুনলে হবে নাকি। তাদের ছেলে পড়াশুনা না করলে চাকুরি করছে কিভাবে এসব বলল।"

"আমারও মনে হয় এগুলো সত্যি না। আর রিংকি যদি অরূপকে বুঝে থাকে, ওদের যদি মিল হয়ে থাকে, তাহলে আর কি সমস্যা।"

"তাই বলে কি আমার মেয়েকে কম শিক্ষিত ছেলের সাথে বিয়ে দিব নাকি।" "এই রিংকি" রিংকির দিকে তাকিয়ে বলল বড়দি, "অরূপের মা বলল, অরূপ নাকি তোকে সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে, পেয়েছিস?"

রিংকি মার দিকে না তাকিয়েই বলল, "ধুর না তো, কোন কিছু পাঠায়নি। আর আমি চেয়েছি নাকি যে পাঠাবে?"

"একটু বল না পাঠাতে, তাহলে একদম শান্তি হত।"

"ধুর যাও তো মা, আমার ভাল লাগছে না একদম এসব, আর ও এমনিতেও বাইরে আছে এখন। কোত্থেকে পাঠাবে এখন।" বেশ গাম্ভিত স্বরেই বলল রিংকি।

রিংকি বেচারার জন্য মায়াই লাগল। সামনে বিয়ে, কই এসময় কত স্বপ্ন বুনবে, কত আনন্দে দিন কাটাবে, আর এসব ঝামেলা এসে জুটেছে। "চল বড়দি, সামনের ঘরে চল।" এই বলে বড়দি কে নিয়ে সামনের ঘরে চলে এলাম।

"আমি যে কি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।" সোফায় বসে পড়ে বলল বড়দি।

"চিন্তা করো না, আমি দেখছি, আমার ফ্রেন্ড রাজন আছে না? ও তো অরূপদেরই গ্রামের, ওর কাছে খোঁজ নিবনে। ও ঠিক জানবে সব। ওর বাসা তো কাছেই, আমি দেখি যাই ওদিকে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু জিজ্ঞেস কর না।" বড়দি যেন আশা খুঁজে পেল। "একটু তাড়াতাড়ি দেখে জানা না।"

"হ্যাঁ আমি এখনই যাই।" এই বলে দরজা খুলে বের হলাম।

বড়দি এল দরজা লাগিয়ে দিতে। বলল, "একটু ভালমতো খোঁজ নিয়ে জানাইস। স্বল্প শিক্ষিত ছেলের সাথে তো মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখছি।" এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে নিলাম। রাজনকে আগে একটা ফোন দেই, আছে কিনা ঘরে। ওরও আবার ছোট বোনের বিয়ে। ছেলে ফ্রান্সে থাকে। পড়াশুনা তেমন করেনি। কলেজ পড়েই ফ্রান্সে চলে গেছে। আহা, রিংকির বিয়েও যদি ফ্রান্সে থাকা কারও সাথে ঠিক হত। তাহলে তো কোন চিন্তাই থাকতো না। ফ্রান্সে থাকা ছেলে স্বল্প শিক্ষিত হলে তো দোষ হয় না॥ ৵

ক্ষমা

(৮৩ পৃষ্ঠার পর)

জানতেও পারিনি। জানতে পারলে আটকানোর চেষ্টা করতাম। নাতি-নাতনি দুটোর জন্যে কষ্ট হয়। টাকা পাওনাদারদের তিক্ত কথার ছোঁবলে অবশেষে বাকি জমিগুলোও বিক্রি করে ঋণশোধ করতে বাধ্য হলাম। এরপর ছেলেটা আর কোন যোগাযোগ রাখেনি। শুনেছি আবার চাকুরী ধরেছে। কিন্তু করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে চাকুরী যে আর নেই তা নিশ্চিত।

আমি দাদুর দিকে তাকিয়ে দেখি টপটপ করে চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর কোন কথা হয়নি দাদুর সাথে। সেদিনের মতো ফিরে এলাম।

সপ্তাহখানেক পরে দাদুর বাড়িতে যাচ্ছি। পথিমধ্যে একজনের সাথে দেখা। কথায় কথায় জানালো- দাদু বাড়িতে নেই।

কোথায় গিয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই বললো, তিনদিন আগে দাদু আর স্ত্রী ঢাকায় গিয়েছে ছেলেকে দেখতে। ছেলেটা নাকি করোনাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। অবস্থা বেশি ভালো নয়।

রাস্তা থেকে ফিরে এলাম। আসার পথে বাইবেলে বর্ণিত 'অপব্যয়ী পুত্রের' কথা মনে হলো খুব॥ ৵

স্মৃতিতে অম্লান

"সংসারের মায়া ছেড়ে স্বর্গীকে পেল যে জন
মৃত্যু প্রভু সত্ত্বে তারে অনন্ত জীবন"

তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার গৃহে চলে গেছ ১১ বছর হয়ে গেছে। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন খ্রিস্টীয় আদর্শে জীবন যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার ভালোবাসার
স্ত্রী: পুষ্প গমেজ
ছেলে-ছেলের বউ: কিশোর-জেনেট, বিপুল-নুপুর, রবি-এনি
নাতি-নাতনী: সাজন, সেলজিন, নাচন, এরিন, আরদিন
গ্রাম: পূর্ব ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

প্রয়াত বার্ণাড গমেজ
জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত সঞ্জীবনী সুধা

ডেভিড স্বপন রোজারিও

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, আমি যখন বিমান "বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের" হিসাব বিভাগে যোগদান করি, তখন সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। বেশিরভাগ বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্বাধীনতার পর "পিআইএ" থেকে ভাগ হয়ে এসে, নবগঠিত বিমানে যোগদান করেছিলেন।

তখন আমার ছুটন্ত-ফুটন্ত ভাব দেখে, সবাই বিভিন্ন কাজে আমাকে এগিয়ে দিতেন। সে সময়ে চলনে-বলনে, বেশ-ভূষায়, সবার চোখে আমি বেশ স্মার্ট ছিলাম। অফিসের বড় কর্মকর্তাদের অনেকে প্রকাশ্যে "স্মার্ট বয়" বলে ডাকতেন। আর সে সুবাদে সমবয়স্ক সহকর্মীদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

একসাথে ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা মারা, নানা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ইত্যাদির কারণে সবাই আমাদের নাম দিয়েছিল, "গরিলা বাহিনী"। সমাজসেবায় জড়িত ছিলাম, ফলে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে মোটামুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। উপস্থাপনা ও বক্তব্য দেওয়া ইত্যাদি, বেশ নির্ভীক এবং গুছিয়ে বলার একটা সহজাত অভ্যাস গড়ে ওঠেছিল। কারও বিদেশ ও অভ্যন্তরীণ বদলীর জন্য বিদায় সভা আহ্বানে আমাদের ডাক পড়তো। এভাবে বিভাগীয় বনভোজন, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনে, আমরা মূখ্য ভূমিকা পালন করতাম। এসব ব্যাপারে আমার ডান হাত ছিল সিরাজ। ওর হাবভাব দেখে, আমি ওকে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ বলে ডাকতাম। তারও একটা বিশেষ কারণ ছিল, একেতো ওর নাম সিরাজ, দ্বিতীয়ত আমরা স্টাফবাসে যাতায়াত করতাম। একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে, তার সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ঠিক যেমন সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে গায়ে-গায়ে ধাক্কা লাগলে, প্রথমে রাগ, পরে অনুরাগ হয়, কিছুটা সেই রকম।

প্রথমদিনে বাসে অফিসে যাওয়ার সময়, সিরাজ আমার পরের স্টপেজ অর্থাৎ ফার্মগেইট থেকে উঠলো। দু'সিটের আসনে, আমি জানালার ধারে বসেছিলাম। সে বাসে উঠেই আমার পাশে এমনভাবে বসলো যে, তার উরাত আমার ওপর অনেকটা উঠিয়ে দিয়ে, হাতটা ঘাড়ের পিছন দিকে প্রসারিত করলো এবং আমাদের দিকে ফিরে একটু মুচকি হাসলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিও একটু হেসে যতদূর সম্ভব সরে বসলাম। এমনিতেই সে নাদুস-নুদুস, তারপরও বসার ছিরি দেখে, প্রথম দিনই ওর উপর-দারুণ গোসা হলো। দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা, এমনকি তৃতীয় দিনেও, এবার আর সহ্য হলো না।

- শান্তভাবেই প্রশ্ন করলাম - আচ্ছা ভাই ! আপনার বাপ-ঠাকুরদারা কেউ কি জমিদার ছিলেন?

-ও বললো, না তো, কেন কি হয়েছে বলুনতো ?

-বললাম- তা হলে, নিশ্চয় আপনি জমিদার।

-সিরাজ হেসে বললো, না ভাই, আমি অতি সামান্য মানুষ।

তখন আমিও হেসে বললাম, তবে এভাবে জমিদারী স্টাইলে যদি বসেন, তবে আমি কিভাবে বসি। সে এবার লজ্জিত হয়ে ঠিক-ঠাকমতো সরে বসলো। বলতে গেলে সেই শুরু, সব সময় ছায়ার মতো আমার সাথে লেগে থাকতো।

সিরাজ, কাজে-কর্মে দারুণ দক্ষ ছিল। সদালাপি এবং পরোপকারী, এ সমস্ত গুণাবলীর জন্য সে সবার কাছে প্রিয় ছিল। একটাই বদভ্যাস, সে "নেশাখোর"। সব ধরণের নেশায় পারদর্শী। সেকশনে কোণায় একটি টেবিলে বসতো। স্যার যখন বিভিন্ন কাজ-কর্মে তার রুমে থাকতেন না, তখন টেবিলের চারিদিকে আগরবাতি জালিয়ে, গাঁজার কল্কে টান দিত। আগরবাতির তীব্র গন্ধে, গাঁজার গন্ধ খুব একটা পাওয়া যেতো না।

এই নেশা দেখে প্রথম-প্রথম প্রতিবাদ করলেও, পরে তার স্নিগ্ধ হাসি দেখে, আমরা এই অনৈতিক কাজটি সহ্য করে নিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝেই নেশায় বুদ হয়ে থেকে ঢুলুঢুলু চোখে গাইতো–

"নেশা লাগিলো রে,
বাঁকা দু'নয়নে নেশা লাগিলো রে,
হাসুনরাজা, পিয়ারির প্রেমে মজিল রে
নেশা লাগিলো রে----- ।

এবার অর্থ বিভাগের বার্ষিক বনভোজনের আয়োজনে চলছে। আমি আমার দল-বল নিয়ে সবকিছুর সুষ্ঠু আয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ঠাটারি বাজার মাংসের অর্ডার দিয়ে ফিরছিলাম। সিরাজ ড্রাইভারকে বললো- গুলিস্থান চলো।

- আমি প্রশ্ন করলাম কিরে, গুলিস্থান কেন ?

- ও নির্বিকার চিত্তে বললো- গেলেই বুঝবি !

সিরাজের নির্দেশমত ড্রাইভার "সাধনা ঔষাধালয়ের" সামনের ফুটপাথ ঘেষে গাড়ীটা পার্ক করলো।

- চল ভিতরে যাই, বলে, আমার আগে এগিয়ে গেল, আমি ওর পিছু-পিছু দোকানে প্রবেশ করলাম। সিরাজকে দেখে দোকানদার এক গাল হেসে বললো–

- স্যার কেমন আছেন?

এই নেশা দেখে প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করলেও, পরে তার স্নিগ্ধ হাসি দেখে, আমরা এই অনৈতিক কাজটি সহ্য করে নিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝেই নেশায় বুদ হয়ে থেকে ঢুলুঢুলু চোখে গাইতো-

"নেশা লাগিলো রে,
বাঁকা দু'নয়নে নেশা লাগিলো রে,
হাসুনরাজা, পিয়ারির প্রেমে মজিল রে
নেশা লাগিলো রে... ।

একবার অর্থ বিভাগের বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন চলছে। আমি আমার দল-বল নিয়ে সবকিছুর সুষ্ঠু আয়োজন ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ঠাটারি বাজার মাংসের অর্ডার দিয়ে ফিরছিলাম। সিরাজ ড্রাইভারকে বললো গুলিস্তান চলো।

- আমি প্রশ্ন করলাম কিরে, গুলিস্তান কেন?

- ও নির্বিকার চিত্তে বললো গেলেই বুঝবি! সিরাজের নির্দেশমত ড্রাইভার "সাধনা ঔষধালয়ের" সামনের ফুটপাত ঘেষে গাড়ীটা পার্ক করলো।

-চল ভিতরে যাই বলে, আমার আগে এগিয়ে গেল, আমি ওর পিছু-পিছু দোকানে প্রবেশ করলাম। সিরাজকে দেখে দোকানদার এক গাল হেসে বললো

- স্যার কেমন আছেন?

- ভাল আছি, বলে সে হাত মিলাল। ওদের আন্তরিকতা দেখে বুঝলাম, তারা পূর্বপরিচিত। এবং সিরাজের অনেক আসা-যাওয়া আছে।

-দোকানদার জিজ্ঞেস করলো কটা দেব স্যার?

-আজ দুটোই দাও, আমাদের দুজনের জন্য।

দোকানদার মাঝারি ধরণের দু'টো "মৃত সঞ্জীবনী সুধার" বোতল ব্রাউন কাগজে মুড়িয়ে, ওর হাতে দিল। সিরাজই দাম দিয়ে দিল। একটি আমার হাতে দিয়ে বললো সারাদিন অনেকতো পরিশ্রম করেছিস। রাতে আহারে আগে খেয়ে নিস্, দেখবি তাজা হয়ে গেছিস। নিমিষে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। দারুণ একটা ঘুমের পর সম্পূর্ণ নতুন লাগবে সকালটা। এটা পানে মৃতকে পুনর্জীবিত করা যায়।

ফেরার পথে হারবাল ঔষধ ও গাছ-গাছালির তৈরি ঔষধের গুণাবলীর উপর দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিল। আমার নির্লিপ্তভাব দেখে, আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করে বললো

"ইহাতে নাহিকো কোন,
মদকতা দোষ, কেবল পানে
করে চিত্ত পরিতোষ।

বাসায় ফিরে টেবিলের উপর যত্ন করে বোতলটা রাখলাম। আমার এক মামা কোলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন তিনি দেখে ফেললেন এবং বললেন-

- ভাগনে, কবে থেকে এ অভ্যাস করেছো? এতো ভাল নয়।

- না মামা, এর পূর্বে কোনদিন খাইনি। আমার এক বন্ধু বললো, এটা নাকি মেডিসিন, খেলে শরীরের সব দুর্বলতা কেটে যায়।

- মামা বললেন- খবরদার খাসনে, তোর নেশা হয়ে যাবে। ফেলে দে এখনই। বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম। আজও সে কথা মনে হলে, মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে ওঠে। তিনি আরও বলছিলেন, শরীরে এনার্জি বাড়াতে চাও তবে ডিম, কলা, দুধ খাও, দেখবে শরীর মন দুটোই সুস্থ থাকবে। এই ছাইপাশ খেলে, একদিন মারাত্মক ব্যাধি হবে।

- এটা ধ্রুব সত্য যে, মাদকাসক্তির মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা খুব কমই আছে। ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে কেবল দেশীদম, তারি (তালেরস গাঁজাইয়া প্রস্তুত মাদকবিশেষ), গাঁজা (সিদ্ধিগাছের জটা হতে প্রস্তুত), ভাং (সিদ্ধিগাছের পাতা থেকে প্রস্তুত মাদকবিশেষ) ইত্যাদির নাম শুনেছি এবং অনেককে বানাতে ও সেবন করতে দেখেছি।

আরও বড় হয়ে শুনেছি বিলেতি মদের কথা, যা শহরের বিত্তবানরা পান করতো। তবে গ্রামের সে সমস্ত বেয়ারা-বাবুর্চীরা গুলশান-বনানীতে বিদেশী সাহেবদের ঘরে কাজ করতো, তারা সাহেবদের খাওয়া বোতলের তলানিতে পরে থাকা মদ জমিয়ে, সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়িতে এসে সাগরদের নিয়ে ভূনা মাংসের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দিতেন।

দিন যত গড়িয়েছে, নেশার দৌরাত্ম্য ততোই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরতিহীনভাবে নেশার নানা উপকরণ নিত্য-নতুন নাম নিয়ে বাজারে এসেছে। কতো বাহারি এদের নাম- ইয়াবা, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এমনকি ঔষধের নামের আড়ালে, অনেকে নেশা হিসাবে ব্যবহার করে। বাজারেও এসেছে নানা সস্তা মদ-যেমন টোটান ইত্যাদি নামে। ফলে অনেকে বিষাক্ত সস্তা মন খেয়ে বিষক্রিয়ায় মরছে পটাপট।

এই নেশার কারণে কতো লোকের যে অকাল মৃত্যু হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিনিয়ত কতো সুখের সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ আমেরিকাতেও মাদকাসক্তদের সংসার ভাঙ্গছে, চাকুরি হারাচ্ছে, সংসারে নানা অশান্তি লেগে আছে।

ছোটবেলায় ধর্মক্লাশে সিস্টাররা বলতেন, তোমাদের কাঁধে দুজন স্বর্গদূত আছেন, একজন ভালকাজে উৎসাহিত করেন, অপরজন মন্দকাজে। আজও আমাদের কোন অনৈতিক কাজ দেখে মহাপ্রভু ও সাধু-সন্তরা কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে বলেন, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, সে সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। কেউ শোনে না। যেমনটি পবিত্র বাইবেলে আছে, প্রভু যিশু শিষ্যত্বের মূল্যায়ণে তিনটি জীবনদায়ী দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন এবং শেষে বললেন, "যার শোনার মতো কান আছে, সে শুনুক"। *(লূক-১৪-৩৫ পদ)*

যখন গুরুজনদের উপদেশ কেউ শোনে না তখন তাদের বাণী ও খনার বচনগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে যেমন

- চোররা না শোনে ধর্মের কাহিনী

- সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

- গুরুর আজ্ঞা যে করে নেট (অমান্য) সে পড়ে ছালার চট।

- সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

- আজ বুঝবি না বুঝবি কাইল, মাথা থাবরাবি পারবি গাইল ইত্যাদি।

- তারপরও আসন্ন বড়দিনে, অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে বেসামাল হয়ে আসর গুলজার করে গাইবে -

মদ কি মজার চিজ
বানাইয়াছে জগদিশ
আমারে একটু বেশি দিস
কম দিস না রে-॥

বেথলেহেমে যিশু

রিতা জ্যাকলিন কাম্পু

দুই হাজার বছর আগে
মুক্তিদাতা এসেছিলেন
বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করে।
খ্রিস্ট একমাত্র, রাখালই বলেছিল
আজ এ গৃহে পরিত্রাণ এলো
ছোট বা বড় মঙ্গলভাবহীন
পরশ্রীকাতর শ্রান্ত হৃদয়ে।
ভাবছি বসে মুক্তির কাজ হয়ে গেছে
এ চরাচরে দিকে-দিকে।
মুক্তিদাতাকে চিনি না,
জানি না কতটুকু জেনেছি।
কতটুকু বা মেনে চলেছি
ভাবছি বসে মুক্তির কাজ হয়ে গেছে
এ চরাচরে।
মুক্তি কি? জানি না।
মুক্তিদাতাকে চিনি না
জানি না কতটুকু জেনেছি কতটুকু বা
মেনে চলেছি শিশু যিশুতে॥

পঞ্চপাণ্ডব ও রাজুদা

জয় চার্লস রোজারিও

রাজুদা আমাদের অলিখিত সর্দার। কিংবা বলা যায় যে, সে পালের গোদা, আর আমরা তার চ্যালাচামুন্ডা। রাজুদা যেখানে, আমরাও সেখানে। আমরা বলতে আমি, নেলু, হিলু, সবুজ আর চিনু। সাথে আরো কিছু ছেলে-ছোকড়া মাঝে-মাঝে যুক্ত হয়। কিন্তু আমরা পাঁচজন হচ্ছি স্থায়ী সদস্য। জাতিসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র যেমন সব বিষয়ে হস্তক্ষেপের বা ভেটো প্রদানের অধিকার রাখে, আমরাও ঠিক তেমনি। আমরা রাজুদা'র পাঁচটি ছায়া। এই পঞ্চপাণ্ডব আর রাজুদা'- মোট ছয়জন হচ্ছি অত্র এলাকার মার্কামারা বাহিনী।

রাজুদা'র চেহারার বর্ণনাটা দেই একটু। রোগা-হ্যাংলা দোহারা গড়ন, মুখটা লম্বাটে। দাঁড়ি যেন খুব কষ্টে কিছু গজিয়েছে। সেই দাঁড়িগুলোকেই রাজুদা নানান স্টাইল করে রাখেন। কখনো ফ্রেঞ্চকাট, কখনো 'ইউ' সেপ, আবার কখনো মুখভর্তি করে রাখে। সবচেয়ে বেশি স্টাইল করেন চুল নিয়ে। মাথায় আগে বেশ ঘন চুলই ছিল রাজুদা'র। এখন সামনে দিয়ে কিছুটা পাতলা হয়ে গেছে।

এই চুল বছর-খানেক আগে ঘাড় অবধি লম্বা করেছিলেন রাজুদা। তারপর একদিন ধাম করে লম্বা চুল পাড়ার সেলুনে বিসর্জন দিয়ে আসলেন। আমরা তো দেখে পুরো থ! "একি রাজুদা! তোমার চুল গেল কই?" রাজুদা সামনে এসে দাঁড়াতে হকচকিয়ে যাওয়া অবস্থা কাটিয়ে প্রশ্ন করে হিলু। আমাদের বাকিদের মনেও একই প্রশ্ন। এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে এত আয়োজন করে যে চুল বড় করা হলো, তা নিমেষে কাটা পড়ে গেল! রাজুদা মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল, "বড় চুল রাখে ভ্যাগাবন্ড যারা, তারা। আমার মত একজন সভ্য ছেলে যে কিনা সমাজের দশটা কাজের সাথে জড়িত তার এমন জংলিভাবে চলাফেরা মানায় না।" শুনে আমরাও মাথা নাড়লাম। রাজুদা যখন বলেছে, অবশ্যই এটা হবে।

কেস কিন্তু ভিন্ন। ঠিক দুইদিন আগে সন্ধ্যায় রাজুদা কোথা থেকে যেন ফিরছিল, তখন পাড়ার টহল পুলিশ রাজুদাকে আটকায়। সচরাচর আমাদের পাড়ায় পুলিশ আসে না। মাদক নিয়ে তখন একটু তোলপাড় চলছে। সেই ইস্যুতে পুলিশ সন্ধ্যার পর টহল দেবার নিমিত্তে পাড়ায় ঘুরছিল। আর রাজুদা'রও কী কপাল! পড়বি তো পড়, সেই পুলিশ ভ্যানের সামনেই পড়লো। লম্বা-লম্বা চুল, মুখে দাঁড়ি, রোগা-পটলা চেহারা দেখে বড় দারোগা তাকে দাঁড় করায় আর সাথের দুই কনস্টেবলকে আদেশ জারি করে তল্লাশি নিতে। বলাই বহুল্য, কিছু পায় না পুলিশ। রাজুদা কোনো ধরণের নেশা করে না। মাঝে-মাঝে শুধু এক-আধটু পান খান। তাও যদি কোনো নিমন্ত্রণ থাকে, কিংবা কোথাও ভালো-মন্দ খান। এখন এই কথা আমরা জানলেও পুলিশ তো আর জানে না। সারা শরীর তল্লাশি করে কিছু না পেলেও কিন্তু রাজুদা রেহাই পেলো না। পুলিশ তার হ্যাংলা শরীরকে দায়ী করে তাদের কাজ শুরু করলো। এত শুকনা শরীর, নিশ্চয় নেশা করে করে এই অবস্থা। চুল-দাঁড়ি বড়-বড়, এ তো নিশ্চিত ফাতড়া ছেলে। নেশা করে করে শরীর স্বাস্থ্যের এই অবস্থা। ব্যস, আর যায় কোথায়! রাজুদার পকেট তাকে নিরপরাধ প্রমাণ করলেও তার শুকনা লম্বা শরীর আর বড় চুল তাকে দোষী সাব্যস্ত করলো। পশ্চাৎ দেশে দু-চারটি ঘাও পড়লো। রাজুদা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে নিজের পশ্চাৎ দেশ রক্ষার নিমিত্তে তিড়িং-বিড়িং করে খানিকক্ষণ লাফালেন। ঘটনা কতদূর গড়াতো তার ঠিক নাই। তখন আমাদের এলাকার কমিশনার আর সেলিম চাচা সেখানে এসে পড়ায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় রাজুদা। কমিশনার কামরুল সাহেব রাজুদা'কে চিনতেন, ঐ যে বলেছিলাম আমরা ছিলাম এলাকার মার্কামারা গ্রুপ। এলাকার অনেক-অনেক ভালোকাজে আমরা, মানে পঞ্চপা-ব আর রাজুদা জড়িত থাকতাম। তো কমিশনার মহোদয় আর সেলিম চাচার প্রদত্ত মৌখিক চারিত্রিক সনদপত্রের বদৌলতে রাজুদা বেকসুর খালাস পেয়ে এক ভোঁ দৌড়ে বাসায় চলে যায়। আর ঠিক তার পরদিনই পাড়ার মোড়ের সেলুনে গিয়ে নিজের মুণ্ডু নাপিতের করতলে সমর্পণ করে। এখন রাজুদা ছোট-ছোট করে ছাঁটা খাঁড়া-খাঁড়া চুলে আর ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়িতে ঘুরে বেড়ান। দেখতে মন্দ লাগে না।

এই রাজুদা হঠাৎ ঠিক করলো যে সে রাজনীতি করবে। ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে প্রায় ছয় মাস হতে চলল বসেই আছে। ছাত্রজীবনে ছাত্ররাজনীতিতে জড়াননি। যদিও কলেজের সিনিয়ররা খুব করে বলেছিল তাদের সাথে লেগে থাকতে। কিন্তু রাজুদা তাতে গা করেননি। "আমি এইসব রাজনৈতিক আদর্শে মানি না। পড়ালেখা করে নিজেকে গড়বো আম সমাজকে চালাবো। এটাই সবচেয়ে ভালো নীতি"- রাজুদা বলেছিল। সাথে-সাথে আমরা পঞ্চপাণ্ডব তার সাথে সুর মেলালাম, "ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

তো এই রাজুদা হঠাৎ রাজনীতিতে নাম লেখাতে চায় শুনে আমরা যার পরনাই অবাক হলাম। হিলু বলল, "হঠাৎ তোমার কী হলো, রাজুদা?" নেলু বলে উঠলো, "এই তো বেশ আছো। কেন খামোখা জোর করে গিয়ে গায়ে কাঁদা মাখা!" সবুজ বলল, "যে কোনো এক দলে নাম লেখাবে, আর বাকি দলগুলো ছিঃ ছিঃ করবে।" আমি আর চিনু বললাম, হ্যা, হ্যা। ঠিক ঠিক।" রাজুদা চোখ বুজে সব কথা শুনছিল। এইবার চোখ মেলে তাকালো। এই চাহনি আমরা বুঝি। আমি আর হিলু লাফ দিয়ে দুই পা পিছিয়ে গেলাম। নেলু, চিনু আর সবুজের চাঁদিতে গিয়ে পড়লো একটা করে চাঁটি। এই এক বাজে স্বভাব রাজুদার। মতের অমিল হলেই ধাঁই করে চাঁটি বসিয়ে দেন মাথায়।

তো যাই হোক, চাঁটি খেয়ে আর চাঁটি মারা দেখে আমরা চুপ মেরে গেলাম। গলা খাঁকাড়ি দিয়ে রাজুদা বলা আরম্ভ করলো, "তোরা যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে ক্যান ফ্যানফ্যান করিস? আমার মাথায় তো কিছু হলেও মাল আছে। আমার আই কিউ অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে ভালো। আলবার্ট আইনস্টাইনের আই কিউ আর এই রাজুর আই কিউ- সমানে সমান। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করে দেখ।" আমরা চুপ। চিনু মৃদু স্বরে বলল, "হক কথা।" রাজুদা আবার বলা শুরু করলেন, "অনেক ভেবে দেখলাম, এলাকার জন্য যেভাবে উন্নয়নকর্ম সাধন করতে চাচ্ছি, তার জন্য বিগ ভলিউমে কাজ করতে হবে। আর এর জন্য আমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। তাই আমাকে রাজনীতিতে নামতে হবে।" একটু থামলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "আমি কারো দলে যাবো না। আলাদা দল বানাবো, আমার নিজের দল। তারপর সতন্ত্রপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে যাবো, নির্বাচিত হয়ে সংসদে বসবো। এইভাবে ধীরে-ধীরে বড় নেতা হয়ে উঠবো, বড়-বড় কাজ করবো। সুবিধা করতে পারলে এক-আধটা মেট্রোরেলও করে দিবো এলাকায়। বিশ্বে প্রথম একক এলাকার জন্য মেট্রোরেল।" এই পর্যন্ত বলে রাজুদা থামলেন দম নিতে। আমাদের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। কল্পনায় একদম সরাসরি দেখতে পাচ্ছি, রাজুদা সাদা পাঞ্জাবির উপর কালো কোট পড়ে সংসদে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। সবাই শুনছে তার কথা।

"এরপর রাজুদা?" হিলুর গলা পেয়ে সংসদ থেকে আমাদের আড্ডায় ফিরে আসলাম। রাজুদা আবার বলতে শুরু করলো, "আমি আর দেরি করতে চাই না। এখনই কাজে লেগে না পড়লে তো পিছিয়ে পড়বো। তাই আমি ঠিক করেছি, আগামী পরশুদিন আমি আমার দলের র‍্যালী বের করবো। র‍্যালী করে এলাকার সবাইকে জানান দিতে হবে আমাদের উপস্থিতির কথা।" আমরা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম আমরা।

রাজুদা লিডার, আমরা ভলেন্টিয়ার। কাজ ভাগ করে দিয়েছে রাজুদাই। আমি আর চিনু মিছিল করার সময় দুই পাশে ভিড় করে থাকা লোকের হাতে লিফলেট গুঁজে দিবো। তাতে লেখা থাকবে, 'আগামীর তরুণ লিডার, জননেতা রাজু আছে আপনাদের পাশে।' অল্প কথায় লোককে জানান দেওয়া। অল্প কথায় কাজ হলে বেশি কথার দরকারটা কী- টাইপ ব্যাপার আর কি! নেলু হ্যান্ডমাইক, র‍্যালীর ব্যানার ইত্যাদি আয়োজন করবে। আর হিলু থাকবে সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে। অনেকটা 'ওয়ান ম্যান আর্মি' টাইপ বিষয়। সবুজের এই দুইদিন ছুটি। সে এই দুইদিন বাসায় থাকবে। বের হবে না। ঘনঘন আদা দিয়ে চা খাবে, দিনে পাঁচ-ছয়বার গার্গল করবে। সকাল-বিকাল রেওয়াজ করবে। কারণ, র‍্যালীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সবুজ। সবুজ শ্লোগান দিবে। আমরা সাথে থেকে কোরাস ধরবো। সবুজের বিকট বাজখাঁই গলা মিছিলের জন্য উপযুক্তই বটে। স্কুলের খেলায় দর্শকসারি থেকে সবুজের চিৎকারেই তো দর্শকমঞ্চ রোমাঞ্চিত হয়! শ্লোগান লিখে আনবে চিনু।

র‍্যালীর দিন স্কুল থেকে ফিরে নাকে-মুখে কয়টা খাবার গুঁজে ছুট লাগালাম মাঠে। চারটা থেকে র‍্যালী। গলির মুখের মতিনের দোকান থেকে র‍্যালী করে লম্বা গলি ধরে শেষ মাথা পর্যন্ত বার-দুয়েক চক্কর দিব। যাক গে, স্পটে পৌঁছে দেখি রাজুদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়ে দাঁড়ানো। বাকিরাও চলে এসেছে। চিনু আবার আসার সময় ওদের বিল্ডিং থেকে চারটা ছেলেকে ধরে এনেছে। চেহারায় চিনলেও ওদের সাথে আমাদের কারোই আলাপ নেই। আলাপ পরিচয়ে জানলাম ওরা আমাদের সমবয়সীই, আবার আমাদের দলে শামিলও হতে চায়। আমরাও ওদের বরণ করে নিলাম।

সব গুছিয়ে নিয়ে আমরা প্রস্তুত র‍্যালী আরম্ভ করতে। রাজুদা একটু ব্রিফিং করে দিল সবাইকে। তারপর সবুজকে ইশারা করলো শ্লোগান ধরতে। গলা খাঁকাড়ি দিয়ে সবুজ চিৎকার দিয়ে শ্লোগান ধরলো, "আমার ভাই তোমার ভাই..."। আমরা পরের অংশ বললাম, "রাজু ভাই, রাজু ভাই।" সবুজ আবার বাজখাঁই চিৎকার, "এলাকার উন্নয়নে দরকার...", আমরা সুর জুড়ে দিলাম, "রাজু ভাই সরকার।"

রাজু ভাই ডান হাতটা মাথার উপর তুলে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে দোলাচ্ছে, যদিও আশেপাশে কেউ নেই। আমরা সর্বসাকুল্যে নয়জন রাজুদাকে ঘিরে গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছি, মানে শ্লোগান দিচ্ছি। মতিনের দোকানের পাশের ফুটপাথে দুইটা কুকুর শুয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। আমাদের শ্লোগান শুরু হওয়া মাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়স্বরে ঘেউঘেউ রব জুড়ে দিল। আমাদের শ্লোগান আর কুকুরের ঘেউঘেউ মিলেমিশে সে এক নরক কাণ্ড। কাস্টমার না থাকায় মতিন বসে ঝিমাচ্ছিল, গগণবিদারী চিৎকারে ধড়মড়িয়ে উঠলো। আশেপাশের বাড়ির মানুষ দুপুরের খাওয়ার পর বিছানায় পড়ে নাক ডাকছিল, সবার ঘুম ছুটে গেল। ভয়ানক কিছু হয়েছে ভেবে দৌড়ে এসে জানালা-ব্যালকনি দিয়ে উকিঁ দিয়ে দেখতে লাগল যে ব্যাপারটা আসলে কী ঘটছে। এদিকে কুকুরের চিৎকারে নতুন ছেলে চারজনের একজন ভয় পেয়ে দৌড় লাগালো। বাকি তিনজন তার সাথে বা তাকে থামাতে পিছন-পিছন ছুটল। গলিতে ছিল একটা মোটরবাইক রিপেয়ার শপ। দোকানের দুই ছোকড়া কান্ড দেখে ভাবলো, বোধহয় ছেলে চারটা চোর, আর আমরা ওদের তাড়া করেছি। ওদের কাছাকাছি যেতেই এক মেকানিক একজনকে জাপটে ধরে ফেলল। আর বাকিরা এসে গণধোলাই শুরু করতে উদ্যত হলো। আমরা বাকিরা দৌড়ে গিয়ে তাদের থামালাম। এদিকে চারপাশে মানুষ জমে গেছে। সবাই মহল্লার। সবাইকে বিস্তারিত বুঝাচ্ছি এর মাঝে পুলিশ এসে হাজির। কে যেন গণ্ডগোল দেখে ৯৯৯ এ ফোন করে দিয়েছে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষেপে এরূপ: সবকিছু বিস্তারিত শুনে সবাই হেসে খুন। পুলিশ সবাইকে সতর্ক করে দিল যে, বিনা অনুমতিতে র‍্যালী, সভা-সমাবেশ করা অবৈধ। এইবার প্রথম আর সবাই ছোট বলে বেকসুর খালাস পেলাম। ও হ্যাঁ, যে রাজুদাকে নিয়ে এত কাহিনী, সে কিন্তু কোন ফাঁকে যেন চম্পট দিয়েছে॥

মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত যে প্রাণ

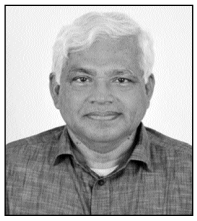

ড. আলো ডি'রোজারিও

ব হুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শ্রদ্ধেয় ফাদার টিম সিএসসি ধর্মযাজক হয়েও কিভাবে একাধারে হতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী, দূরদর্শী নেতা, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, সুলেখক, বলিষ্ঠ সম্পাদক, দক্ষ সংগঠক, সমাজ বিশ্লেষক ও গবেষক, প্রশিক্ষক...তা আমার কাছে এক বড় বিস্ময়। তাঁর সমন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। বিশপীয় ন্যায় ও কমিশনে তাঁর সাথে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কয়েক বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। পরে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাসে কাজ করাকালে তাঁর সাহচর্য ও পরামর্শ পেয়েছি। কর্মোপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বহুবার তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছি। তাই সাহস করলাম কিছু লিখতে, তাঁর সম্পর্কে।

শ্রদ্ধেয় ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম সিএসসি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের দুই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের মিশিগান শহরে জন্ম নেন ও মারা যান ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই ও দুই বোন। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা শেষ করে মিশনারী হিসেবে তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশে আসেন। চিকিৎসার জন্যে শেষবারের মতো ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ছেড়েছেন। এইসব তারিখ, সাল ও সংখ্যায় দুই সংখ্যাটি রয়েছে। ফাদার টিমের যাপিত জীবন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লিখতে বসে আমি সেজন্যে দুই সংখ্যাটি বেছে নিয়েছি।

তিনি দুই মহাদেশের (উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার) দুই দেশে (যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে) বসবাস করেছেন। পড়াশুনা করেছেন দুই বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানার নটর ডেম ও ওয়াশিংটনের কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞান ও কলার দু'টি বিষয় পড়েছেন, কলায় দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে জীববিদ্যা। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই ওয়াশিংটনের কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি জীববিদ্যায় খুব কম সময়ের মধ্যে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

ফাদার টিমের কর্মজীবন মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত: তিনি ছিলেন একদিকে একনিষ্ঠ একাডেমিক, অপরদিকে নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। একনিষ্ঠ একাডেমিক হিসেবে তিনি সময় দিয়েছেন দু'টি কলেজে- ঢাকার নটর ডেম ও হলি ক্রশ কলেজে; দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছেন এশিয়ার দুই দেশে- থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে, আবিষ্কারক হিসেবে ঘুরেছেন দুই মহাদেশে- এশিয়া ও এন্টার্কটিকায়। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি শতাধিক পরজীবী কীট ও কৃমিজাতীয় প্রাণীর আবিষ্কারক, কয়েকটি কীট ও কৃমিজাতীয় প্রাণীর নামও তাঁর নামানুসারে রাখা হয়, এর মধ্যে একটির নাম- টাইনী টিম।

নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী হিসেবে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে, সৃজনশীলতা দেখিয়েছেন মানবউন্নয়ন উদ্যোগে, সাহসী ভূমিকা রেখেছেন মানবাধিকার সংরক্ষণে। ত্রাণ, পুনর্বাসন ও মানব উন্নয়নের কাজে দেশের বড় দু'টি এনজিও- কারিতাস ও আশার কর্মকাণ্ডে বহু বছর ধরে ফাদার টিম বিভিন্ন ভূমিকায় অবদান রেখেছেন। কারিতাসের তিনি দ্বিতীয় নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। তবে কারিতাসে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন প্ল্যানিং অফিসার হিসেবে। শেষের দিকে তিনি কারিতাসের কনসালটেন্ট ছিলেন।

তিনি যে ঘূর্ণিঝড়ের পর মনপুরা দ্বীপে ত্রাণকাজ শুরু করেন সেটা বাংলাদেশের দক্ষিণে আঘাত হেনেছিল নভেম্বরের ১২ তারিখে। নটর ডেম কলেজের ত্রাণ দল নিয়ে ফাদার টিম ঢাকা হতে চট্টগ্রাম হয়ে মনপুরা রওনা দেন নভেম্বরের ২০ তারিখে। তাঁর ত্রাণ দলে দুইজন যাজক ছিলেন- ফাদার পিশাতো সিএসসি ও তিনি নিজে। তখনকার ঐ ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ২০ ফুট। মনপুরায় ত্রাণকাজের অভিজ্ঞতা ফাদার টিমের জীবন পাল্টে দেয়, তিনি সেখানে সম্যক ধারণা পান গ্রামীণ অন্যায্যতার ধরন ও সেসবের কারণ সম্পর্কে। মনপুরা থেকে ঢাকায় ফিরে প্রথমে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতার ওপর প্রচুর লেখালেখি করেন যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ার সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষ সংগঠক হিসেবে অন্যান্যদের সাথে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেন দু'টি সমন্বয়কারী সংস্থা, এসোসিয়েশন ফর ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীজ ইন বাংলাদেশ (এডাব); ও কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ (সিসিএইচআরবি)। বাংলাদেশের বাইরে আরো দু'টি সংস্থা- সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস; ও জাস্টিস অ্যান্ড পীস কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস্ ইন এশিয়া গঠনে তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন। এই দু'টি সংস্থাও সময়ন্বয়কারী সংস্থা, মানবাধিকার কার্যক্রমের।

দেশে ও বিদেশে বহুল পঠিত মানবাধিকার বিষয়ে ফাদার টিমের লেখা দু'টি চটি বই: ১। বাংলাদেশে ন্যায্যতা ও শান্তি- এই চটি বইটি বাংলায় ১,৫০০ কপি ছাপানো হয়েছিল আর প্রতি কপির মূল্য ছিল এক টাকা; ২। ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের কাজ করার একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা নামের দ্বিতীয় বইটি প্রথমে ইংরেজীতে হংকং হতে ছাপানো হয়, পরে তা বাংলায় অনুবাদ করা হয়। বইটি অনুবাদ করেছিলেন মি. কমল নিকোলাস কস্তা এবং সেটা ছাপিয়েছিল- হটলাইন, এশিয়া এবং বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন, বাংলাদেশ। ফাদার টিম মোট কয়টি বই লিখেছেন- তা আমার জানা নেই। জানি না, তা কেউ জানেন কী না। আমার কাছে তাঁর পাঁচটি বই আছে। তিনি লিখেছেন এমন আরো দুইটি বইয়ের নামও আমার জানা আছে।

বাংলাদেশে মানবাধিকার বিষয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে করা হয় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টাডি: ১। ঢাকা শহরের মহিলা কর্মজীবীদের অবস্থা, ৭০০ গৃহকর্মীসহ মোট ৯০০ মহিলা কর্মীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। এই স্টাডি প্রতিবেদনটি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত জার্ন্যাল অব এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স-এ প্রকাশিত হয়েছিল;

২। পোশাক কারখানার মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ে অপর ষ্টাডিটিতে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১,০০০ জন, তারা ছিলেন ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৫৪টি গার্মেন্টস কারখানা হতে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ও বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের যৌথ আয়োজনে ঢাকার প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে এই ষ্টাডি প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরদিন এই সংক্রান্ত খবর ঢাকার সব ক'টি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। ফাদার টিমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি শেষোক্ত স্টাডির সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলাম। মহিলা শ্রমিক বোনদের সাক্ষাৎকার নিতে তখন আমাকে চট্টগ্রামে সহায়তা করেছিলেন মি. আখিলা ডি'রোজারিও এবং ঢাকার সাভারে সহায়তা করেছিলেন মি. নির্মল রোজারিও।

তিনি নিজে দু'টি স্লাইড শো তৈরী করে বিভিন্ন মানবাধিকার সেমিনারে ব্যবহার করেন: প্রথমটি, সিলেটের চা শ্রমিকদের অবস্থার ওপর এবং দ্বিতীয়টি, ভারত ও বাংলাদেশে দলিত জনগণের অবস্থাকে ঘিরে। তিনি দু'টি বিষয়ের ওপর একাধারে অনেক প্রবন্ধ লিখেন ও সেসব প্রবন্ধের সাইক্লোস্টাইল কপি জনসচেতনতাসৃষ্টির জন্য বিতরণ করেন। বিষয় দুটির একটি ছিল- পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী জনগণের অবস্থা এবং অপরটি ছিল- কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে ভূমি সমস্যা। বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থার ওপর লেখা তাঁর একটি বই লন্ডন হতে প্রকাশিত হয়।

ফাদার টিমের দু'টি বিখ্যাত উক্তি যা সারাক্ষণ মনে রাখি: ১। পোকামাকড়ের চেয়ে মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ২। সময়মতো কাজটি পেতে চাইলে সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষটিকে কাজটি করতে দাও। প্রথম উক্তিটি তিনি করেছিলেন তাঁর একাডেমিক জীবন ছেড়ে আসার প্রাক্কালে, বিজ্ঞানী বন্ধুদের উদ্দেশে। আর দ্বিতীয় উক্তিটি তাঁর মুখে শুনেছি একাধিকবার। দ্বিতীয় উক্তির চমৎকার উদাহরণ ছিলেন তিনি নিজে, সবসময় মহাব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করতে অনুরোধ করলে কখনো তিনি না করতেন না, এমনকি নির্ধারিত সময়ের বহু আগেই কাজটি শেষ করতেন।

তাঁর বিশেষ দু'টি দক্ষতা- অতি দ্রুত পড়তে পারা ও অনবরত লিখতে থাকা। তিনি মানুষের গড়পরতা পড়ার গতির চেয়ে দ্বিগুণ বেশী পড়তে পারতেন। এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন- পড়বার সময় আমি আমার চোখ ডানে ও বামে সরাই না, শুধু অক্ষিগোলক সরাই। তাতে দ্রুত পড়া যায়। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, ঘটনা সত্য। আর লেখার কথা কী লিখব, তিনি তো সারাক্ষণই লিখতেন। যে কোন কাগজেই লিখতেন। ছোট কাগজ, ছেঁড়া কাগজ, খামের উপরে, খাম ছিঁড়ে ফেলে তার ভেতরে, সর্বত্রই তিনি লিখতেন। সেজন্যে তাঁর লেখা মোট কয়টা বই বা প্রবন্ধ আছে তা আজও কেউ জানেন না, এই বিষয়টি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। তাঁর সম্পাদিত ঢাকা লেটার নামক নিউজলেটার কী যে তথ্যবহুল ছিল! আর হটলাইন নিউজলেটার? যেন মানবাধিকার বিষয়ক দলিল এক একটা কপি। এসবের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য বুঝতে গবেষণা দরকার। সামাজিক গবেষণা বিষয়ে আমাদের দৈন্যতা যে কবে এবং কীভাবে কাটবে! এটা আমাদের বড় একটা দুর্বল জায়গা, স্বীকার করতেই হয়।

আশা করি খুব বেশি বেমানান হবে না যদি দু'টি ব্যক্তিগত বিষয় এখানে সহভাগিতা করি: প্রথমটার সময়কাল ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। ফাদার টিম জানতে চাইলেন, আমি বিদেশে গিয়ে আরো পড়তে চাই কি না। খুব একটা না ভেবে সাথে সাথেই উত্তর দিলাম, তা সম্ভব না । কারণ বছর শেষে আমি বিয়ে করব, মেয়ে ঠিক, বিয়ের তারিখও চূড়ান্ত। তিনি হেসে বললেন, একটু সময় নিয়ে ভেবে দেখতে ও যাকে বিয়ে করব তার সাথে পরামর্শ করতে । পরামর্শ করতে গিয়ে আমি ধরা খেলাম। হবু বউ পড়তে যেতে মত দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে চলে গেলাম। ফাদার টিম সব ব্যবস্থা করলেন। আমাদের বিয়ে পিছিয়ে দিতে হয়েছিল দুই বছরের জন্য। আমার মতো অনেককেই তিনি নিজে থেকে দেশে-বিদেশে পড়তে উৎসাহিত করেছেন। বিদেশে পড়ার জন্য স্কলারশীপ খুঁজে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটির সাথে সম্পর্কিত। সময়াভাবে ঢাকায় টোফেল দেয়া হ'ল না। যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হবার আগের দিন ফাদার টিম মুখবন্ধ একটি খাম আমার হাতে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দিন অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে তা জমা দিতে বললেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগণ অঙ্গরাজ্যের পোর্টল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছার পরদিন আমি তাই করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি অফিসের লোকজন জানালেন, নির্ধারিত টোফেল স্কোর ছাড়া আমার ভর্তি অসম্ভব। আমার তো কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সমাজ বিজ্ঞানের ডীন অফিসে। তিনি আমাকে ভর্তির অনুমতি দিলেন এই শর্তে, আমি যেন প্রথম সেমিষ্টার চলার সময় টোফেল সেরে ফেলি। ফাদার টিমের দেয়া চিঠি দেখে তিনি এই ব্যতিক্রম করেছিলেন। ফাদার টিম আমার ইংরেজী দক্ষতা বিষয়ে লিখেছিলেন, আগে পড়তে পাঠানো দু'টি ছেলের চেয়ে এই ছেলেটি বেশী ভালো ইংরেজী বলতে না পারলেও ভালো লিখতে পারে। সেজন্যে ছেলেটিকে টোফেল স্কোর ছাড়াই ভর্তি করা যেতে পারে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য- ফাদার টিমের সুপারিশের কী যে মূল্য! তাঁর সুপারিশে কতজন যে আমার মতোন উপকৃত হয়েছেন তা কেইবা জানেন।

বলা হয়ে থাকে, জ্ঞানই ক্ষমতা। আবার এটাও বলা হয়ে থাকে, সম্পর্কই ক্ষমতা। ক্ষমতা সম্পদ বাড়ায়। সম্পর্ক নিজেই সম্পদ। ফাদার টিমের জ্ঞান ছিল। ছিল তাঁর সম্পর্ক- সমাজের প্রথম সারির মানুষের সাথে যেমন, তার চেয়ে বেশি সমাজের সর্বশেষ সারির প্রান্তিক মানুষের সাথে। অবহেলিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের সাথে তাঁর ছিল বিশেষ আন্তরিক ও মানবিক সম্পর্ক। জ্ঞানে ও সম্পর্কে ক্ষমতাবান ফাদার টিম তাঁর ক্ষমতার সবটুকু খুবই সযতনে, অসীম সাহসে ও হিসেবী সতর্কতায় ব্যবহার করেছেন প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে, তাদের অধিকার সংরক্ষণে ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়।

আমাদের মতো দেশে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য দয়ার কাজ, কল্যাণমূলক কাজ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ করা তেমন কঠিন না। আর এসব কাজের প্রশংসাও সহজে পাওয়া যায়। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিকার সংরক্ষণের ও অন্যায্যতা নিরসনের কাজ খুব সহজ না। নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতো বলে আমাদের দেশের কেউ কেউ ফাদার টিমের মানবাধিকার ও ন্যায্যতা বিষয়ক কাজকে পছন্দ করতেন না। তাই তারা বিভিন্নভাবে ফাদার টিমের কাজকে বাঁধাগ্রস্ত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। কারণ অনেকেই তাঁর কাজকে জোরালো সমর্থন দিয়েছেন।

সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাঁর কাজের প্রতি।

জানা মতে, ফাদার টিমের দুইটি অপূরণীয় ইচ্ছে: ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে যাবার পর বাংলাদেশে ফিরে আসতে না পারা ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব না পাওয়া। বাংলাদেশে ফিরতে না পারার দু'টি কারণ: দুর্ভাগ্য ও অসুস্থতা। দুইবার টিকিট কেটেও ডাক্তারের অনুমতি না পাওয়াতে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। নাগরিকত্ব না পাবার দু'টি কারণ: সরকারের কোন-কোন বিভাগের অনীহা ও তাঁর দরখাস্তের পেছনে নিরন্তর লেগে না থাকা। চেষ্টা করা যেতে পারে মরণোত্তর নাগরিকত্ব পাবার জন্যে।

মানব সেবা ও মানব উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য ফাদার টিম দু'টি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সম্মাননা পান। প্রথমটি হ'ল বিশ্বের ১৩০ কোটি কাথলিক ধর্মবিশ্বাসীর র্সপ্রধান ধর্মগুরু ভটিকানস্থ মহামান্য পোপ মহোদয়ের নিকট হতে, সর্বোচ্চ সম্মাননা, ক্রুশ অব অনার পদক, যা তিনি পান ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। আর এশিয়ার নোবেল পুরস্কার খ্যাত র‌্যামন ম্যাগসাইসাই এওয়ার্ড তাঁকে দেয়া হয় ১৯৮৭ সালে। এই দুই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছাড়াও তিনি বাংলাদেশে পেয়েছেন- বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এওয়ার্ড ২০১২ সালে, বাংলাদেশ সরকারের কাছ হতে। সেসাথে তিনি পেয়েছেন জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার এওয়ার্ড, এটাও তিনি পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকেই।

কাছে ছিলাম যখন বা একসাথে দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেছি যখন, তখন দেখেছি ধর্মযাজক হিসেবে তাঁর ঈশ্বর নির্ভরতা, প্রার্থনার জীবন ও আধ্যাত্মিকতা। সেসাথে দেখেছি বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতা। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের শৃংখলা ও কঠোরতা মেনে চলতেন সদা সর্বদা। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক এই দুই জীবনের এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁর জীবন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল এক মানুষ।

যে কোন একজন খ্রীস্টানের দু'টি প্রধান করণীয়- **প্রথমত:** ঈশ্বরকে ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ ভালোবাসা; ও **দ্বিতীয়ত:** আশেপাশের যে কোন মানুষকে নিজের মতো ভালোবাসাসহ তাঁর কল্যাণ করা। ঈশ্বরকে ভালোবেসে ফাদার টিম হয়েছিলেন সংযমী, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, একজন পবিত্র ধর্মযাজক। মানবপ্রেমী হিসেবে মানুষকে ভালোবেসে মানুষেরই কল্যাণে, সেবায় ও মর্যাদা রক্ষায় তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর সারাটা জীবন। এই ভাবে যাঁরা পরের তরে করে জীবন দান, তাঁদের নেই যে জীবনের কোন অবসান। তিনি বেঁচে আছেন । বেঁচে থাকবেন। তাঁর কাজের মাঝে। আপনার, আমার ও সবার অন্তরে। যুগ যুগ ধরে।

ফাদার টিমকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার অবর্তমানে আপনার এই সুন্দর ও অর্থপূর্ণ কাজ কীভাবে ও কে চালিয়ে নেবেন? তিনি একটু ভেবে উত্তর দিয়েছিলেন, আমাকে ও আমার কাজকে যারা ভালোবাসেন তারাই আমার কাজ অব্যাহত রাখবেন। আমরা ফাদার টিমকে গভীরভাবে ভালোবাসি। তাঁর কাজকেও আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি। আসুন, আমরা তাঁর মানব উন্নয়ন, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি॥

বড্ড অসময়ে চলে গেলেন সবুজ

ফাদার কমল কোড়াইয়া

সবুজের সাথে আমার পেশাগত কাজ শুরু ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে। আমি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক হিসেবে সে সময়ই লক্ষ্মীবাজারে সুভাষ বোস এভিনিউস্থ খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন শুরু করেছি। সবুজ ক'বছর ধরেই রেডিও ভেরিতাসে বাংলা বিভাগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরীতে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও'কে খণ্ডকালীন সহায়তা করছিলেন। কমার্সে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা প্রাণ-চাঞ্চল্যেভরা টকবগে যুবক। প্রথম দিকে সবুজের আগ্রহ ছিল খেলাধূলা বিষয়ক সংবাদে। সাথে লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আদমজী থেকে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করতেন। দরাজ কণ্ঠস্বর। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। মানসম্মত উপস্থাপনা। সৃজনশীল। বাস্তববাদী। উচ্চমার্গের সংগঠক। মিশুকে। নিবিড় পাঠক। বন্ধু-বৎসল। আরও কত গুণে যে সবুজকে আখ্যায়িত করা যাবে! এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সাইফুদ্দীন সবুজ আমাদের মাঝে আর নেই। ১৩ এপ্রিল দুদিনের অসুস্থতায় না ফেরার দেশে চলে গেছে। শুনব না আর ওর মুখে, 'ফাদার কেমন আছেন?' ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সবুজ রেডিও ভেরিতাস বাংলা বিভাগের সাথে আর আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত ছিলেন না। তবুও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও রেডিও ভেরিতাস বাংলা বিভাগকে সবুজ পুষে রেখেছেন মনের গহীনে।

আরভিএ'র সুবর্ণ জয়ন্তীতে অন্যান্য অতিথিদের সাথে সাইফুদ্দিন সবুজ (ক্রসচিহ্নিত)

লক্ষ্মীবাজারস্থ খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতেবেশী'র সম্পাদক হিসেবে দাযিত্ব পালনকালে সবুজ ছিলেন আমার অন্যতম একজন উপদেষ্টা। যখনই কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হতো সবুজ উদ্ধারকারী হিসেবে পাশে দাঁড়াতেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। কাথলিক সর্বোচ্চ ধর্মগুরু মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস ৩০ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। আমি ছিলাম মিডিয়া প্রধান সমন্বয়কারী। বিশ্বমিডিয়া কর্মীদের সামাল দিতে হবে। মানতে হবে রোমান নানা কঠোর নিয়ম-নীতি। সবুজই একমাত্র অখ্রিস্টান যিনি কোন কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপগণ সবুজকে ভালমতই চিনতেন। কেউ কোন আপত্তি করেননি। পোপ মহোদয়ের ভাষণ, বক্তব্য, স্থান, সময়-সবই আমাদের সাথে-সাথে বিশ্বমিডিয়া কর্মীদের কাছে তুলে দিতে হত। এ গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজই আমি করেছি সবুজের সহযোগিতায় সবুজের সেগুনবাগিচার অফিসে বসে। তার অফিসটা আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সবুজ কাজ করতে-করতে শিখেছেন। নিজের আগ্রহেই তিনি শিখেছেন। টাকার পেছনে না ছুটে তিনি সময় দিয়েছেন জ্ঞান অর্জন আর শেখার পেছনে। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে পাঁচটি বিভাগ: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, জেরী প্রিটিং প্রেস, প্রতিবেশী প্রকাশনী, বাণীদীপ্তি ও জ্যোতি কমিউনিকেশন। সবগুলো বিভাগেই ছিল সবুজের অবাধ পদচারণা। বাণীদীপ্তি বিভাগের একটি অঙ্গবিভাগ হল রেডিও ভেরিতাসের বাংলা বিভাগ। কমিউনিটি অনুষ্ঠাননির্ভর রেডিও ভেরিতাসে কাজ করতে করতেই সবুজ বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও-এর উদ্যোক্তাদের প্রথম সারির একজন তা নিসন্দেহে বলা যায়। গোটা বাংলাদেশে আনাচে-কানাচে সবুজ ঘুরে বেড়িয়েছেন; সরাসরি শ্রোতাদের অংশগ্রহণে নাটিকা, কথিকা, আলোচনা সভা, সমবায় সমিতি, কৃষি ও পারিবারিক নানা সুখ-দুঃখসহ খেটে খাওয়া মানুষের মনের কথাগুলোই সবুজ তাদেরই অংশগ্রহণে (তাদের কণ্ঠে) তাঁর অনুষ্ঠানে তুলে এনেছেন। তাই গ্রাম-গঞ্জের মানুষেরা অবাক-বিস্ময়ে রেডিও ভেরিতাসে তাদের কণ্ঠ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতো। অজানা-অখ্যাত ফিলিপাইন থেকে সম্প্রচারিত রেডিও ভেরিতাসের বাংলা অনুষ্ঠান পরিণত হল গ্রাম-বাংলার অনুষ্ঠানে। রেডিও ভেরিতাস থেকে প্রতিদিন সম্প্রচারিত ১৭ ভাষার মধ্যে বাংলা অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তার শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছিল। বাংলায় প্রকাশিত ৮০ বছরের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর নিয়মিত লেখক ছিলেন সবুজ। দুই বাংলার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে সবুজের লেখার পাঠকপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর একটি পাঠক শ্রেণীও তৈরী হয়েছিল। সহজ-সরল ছোট বাক্যে জীবনের কথা নিয়ে লেখাগুলো পড়া শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠক যেন অতৃপ্তই থেকে যেতেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো যেন নিশ্বাসেই লেখাটা পড়া শেষ করতে চাইতেন পাঠক। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বর্তমান ফরমেটে অঙ্গসজ্জা, ছবি বিন্যাস ও আধুনিকায়নে সবুজের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসী পাঠক-শ্রোতা সবুজকে একজন